দাম : বারো টাকা

ভাড়াটে সেনা দিয়ে
যুদ্ধ জয় করা যায় না
— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ২২ নভেম্বর, ২০২১।। ৫ অগ্রহায়ণ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

শিশুপাচার
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান উদ্বেগজনক

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২২ নভেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

তৃণমূল 'কঠিন ঠাঁই' আর বিজেপি 'বড়ো পার্টি' তাই কি সরব কিছু নেতা? ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মারা গেলেই ভালো যতই হোক কালো ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বৌদ্ধ পরম্পরায় অর্জিত সম্পদে তৃপ্ত মানুষটিই ধনী ☐ পেমা খাণ্ডু ☐ ৮

বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধি বিরোধীদের রোষ ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

ভাড়াটে সেনা দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না ☐ অভিমন্যু রায় ☐ ১১

ক্রুসেডের আগে বিজ্ঞানে গ্রীকদের কোনও অবদান ছিল না ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ১৩

সস্তায় চীনা পণ্য কেনা মানে আরও সস্তায় মেরুদণ্ড বিক্রি করা ☐ অম্লান কুসুম ঘোষ ☐ ১৬

করোনা অতিমারীতে বহুলাংশে বেড়েছে নারী ও শিশু পাচার ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ২৩

প্রতি আট মিনিটে একটি শিশু পাচার হয়ে যায় আমাদের দেশ থেকে ☐ অনামিকা দে ☐ ২৭

বালিকাবধুর সংখ্যায় এগিয়ে বাঙ্গলা ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ২৯

হর-গৌরীর বিবাহের স্মৃতিবিজড়িত মীনাক্ষী মন্দির ☐ কৌশিক রায় ☐ ৩১

প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে সেখান হতে স্বপ্ন নামে ☐ ড. তরুণ মজুমদার ☐ ৩৫

তালিবানদের হাত থেকে রেহাই পাবে না পাকিস্তানও ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৩৬

বাংলাদেশের হিন্দু গণহত্যায় হাসিনা সরকারের ভূমিকা সন্দেহজনক ☐ ধীরেন দেবনাথ ☐ ৪৩

স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন ☐ ৪৭

পশ্চিমবঙ্গে কৃষককে দিনমজুরে পরিণত করেছে বামেরা ☐ শেখর চক্রবর্তী ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ চিত্রকথা ☐ ৫০

প্রকাশিত হবে
২৯ নভেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৯ নভেম্বর
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় সংবিধান

আগামী ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান দিবস। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হবে। থাকবে সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা অজানা তথ্য। লিখবেন অমলেশ মিশ্র, বিমল শংকর নন্দ প্রমুখ

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

NIPHA EXPORTS PVT. LTD.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিশু 'নারায়ণের' অবমাননা

কবি বলিয়াছেন—'শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে।' একথা শুধু কবির নহে, সব মানুষের কথা, সমস্ত যুগেরই বাণী। আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ সকলেই শিশু হইয়া জন্ম লহেন। পরে তাহার শিক্ষা, পিতা-মাতার আশীর্বাদ, পারিবারিক পরিবেশ, নিজের রুচি তাহাকে যোগ্য জায়গায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রত্যেক শিশুই জন্মায় নিজস্ব মানসিক গঠন লইয়া। পিতা-মাতা সঠিক দিশা দিয়ে তাহার চলার পথকে সুগম করিতে পারে। পিতা-মাতার সঙ্গে সমাজেরও কিছু অবদান থাকে শিশুর বড়ো হইয়া ওঠার পিছনে। প্রথমে শিক্ষক বিভিন্ন স্তরে, আত্মীয়স্বজন, কর্মক্ষেত্রের সহযোগী ইত্যাদি। সকলের সাহচর্যে শিশু যে শুধুমাত্র বয়সে বড়ো হইয়া উঠে তাহাই নহে, দেশের সুনাগরিকও হয়। দেশ ও সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে—ইহাই স্বাভাবিক।

প্রকৃতির নিয়মে আকাশ যেমন পরিষ্কার থাকে তেমনই ঘনকালো হইয়া দুযোর্গের পূর্বাভাস দেয়। সব শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না। অনেকের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, দিকভ্রম হইয়া য়ায়। যখন সে বুঝিতে পারে তখন আর উপায় থাকে না। শিশু পাচারের সূত্রপাত ঘটে এই দিশাহীনতা হইতেই। কিছু দুষ্ট বুদ্ধি লোক ভালো কাজের মুখোশ পরিয়া অনেক পথভ্রষ্ট শিশুকে সাহায্য করার নামে শিশুকে লইয়া ব্যবসা করে। অনেক পিতা-মাতা জানিয়াও না জানিবার ভান করিয়া বা অর্থের বিনিময়ে শিশুকে বিক্রয় করিয়া থাকে। অসাধু দালালরা শিশুকে দেশ থেকে দেশান্তরে পাচার করিয়া কুকর্ম করিবার জন্য প্রশিক্ষণে লিপ্ত করিয়া থাকে। কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে সরকারি হোম থেকেও শিশু পাচারের ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে শিশুকে নারায়ণ বলা হইয়া থাকে। শিশুর আগমনে গৃহের অঙ্গন জীবনের নতুন আলোকে ঝলমল করিয়া ওঠে। শিশুর অবোধ হাসি পিতা-মাতার মনকে নানাবিধ কল্পনায় রঙ্গিন করিয়া তোলে। কিন্তু রাজনীতির কলুষে দুর্বৃত্তায়িত বর্তমান সমাজে সহজ-সরল গৃহপ্রাঙ্গণটিকে দলিত করিবার লোকেরও তো অভাব নাই। তাই দরিদ্রের স্নেহক্রোড় হইতে প্রায়শই তাহার আদরের শিশু চুরি হইয়া যায়। মাঝে মাঝে অবির্ভাব ঘটে মুখোশধারী কতিপয় বন্ধুর। তাহারা ছলছুতা করিয়া অভাবী পিতা-মাতাকে বোঝান, বাড়ির তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলেটিকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি দিলে কলকাতায় বা মুম্বাইতে কর্ম মিলিবে। নিকটভবিষ্যতে পরিবারটির আর কোনও অভাব থাকিবে না। সুদিনের আশায় পিতা-মাতা যাইতে দেন। পরে এই শিশুর স্থান হয় মধ্যপ্রাচ্যে। কিংবা পাকিস্তান আফগানিস্তানের জঙ্গিদের ডেরায়। কন্যাশিশু অপহৃত হইলে তাহার স্থান হয় বড়ো বড়ো শহরের গণিকাপল্লীতে। তাহাদের খোঁজ মিলিলেও লোকলজ্জার ভয়ে ঘরে ফিরাইয়া লইতে চাহেন না পিতা-মাতারাই। যদিও সেই গণিকার উপার্জনে সংসার চালাইতে তাহাদের সম্মানে বাধে না।

এই করুণ পরিস্থিতির অবসান হইতে পারে একমাত্র সরকার উদ্যোগী হইলে। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎও বারংবার অবমানিত হইবে।

সুভাষিতম্

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণাঃ ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ।
পরগুণপরমাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।।

সৎপুরুষেরা কায়মনোবাক্যে অমৃতময়। তাঁরা ত্রিভুবনে পরোপকাররূপ সুধা বিতরণ করে নিজেরা সকলের প্রিয়পাত্র হন। অন্যের পরমাণুতুল্য গুণকে তাঁরা পর্বতপ্রমাণ জ্ঞান করেন ও নিজেদের হৃদয়ের বিস্তার ঘটান।

তৃণমূল ‘কঠিন ঠাঁই’ আর বিজেপি ‘বড়ো পার্টি’ তাই কি সরব কিছু নেতা?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

১৭ ডিসেম্বর কলকাতা আর হাওড়ার পুরভোট। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ ওয়ার্ড আর হাওড়ার ৬৬টি ওয়ার্ডে নির্বাচন। বাকি রইল আরও ১২৩টি পুরসভা আর কর্পোরেশন।

এক প্রবীণ বিজেপি- নেতার কথায় ‘প্রাণপণ লড়ব। হারলে অবাক হবেন না। কয়েকদিন আগেই পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব থেকে তাঁকে হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০২১-এর ভোটে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টি-তে এগিয়ে ছিল বিজেপি। তার মধ্যে ছিল এই নেতার ওয়ার্ড।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে কলকাতার ৫১টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি। হাওড়ার ৬৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬২টি দখল করে তৃণমূল। বিজেপি আর বামপন্থীরা ২টি করে ওয়ার্ড পায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই সুবিধা। তিনি নিজেই দল আর শেষ কথা। ইদানীং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্লা পাল্টাচ্ছেন। কিন্তু দল বিরোধীদের ক্ষমা নেই। যা বিজেপিতে আছে।

বিশ্লেষকদের মতে ‘বিজেপি-কে বলা হয় ডবল ইঞ্জিনের দল। কিন্তু কামরাহীন ট্রেনের কোনও দাম নেই’। দলের সংসদীয় বোর্ড সর্বচ্চ নীতি নির্ধারক সমিতি। সেখানে অনেক নেতা রয়েছেন।

রাজ্য বিজেপিতে ভাঙন কোন্দল অব্যাহত। দলবদলুর সংখ্যাও বাড়ছে। অভিষেককে তোলাবাজ বলে অনেকে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। অভিষেক তাদের সাইডলাইন খেলোয়াড় হিসেবে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এটাই তার সুইট রিভেঞ্জ বা মিষ্টি প্রতিশোধ। মমতা এদের গদ্দর বলেছিলেন।

বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য বিজেপির কিছু নেতার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দল হেরে যাওয়ায় তারা সরব হয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক।

পরাজিতদের যুক্তি নেই। সদস্য সংখ্যার নিরিখে বিজেপি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দল। আর ভারতের ভোটারের কাছে সর্বপ্রিয় দল।

বড়ো দলে একটাই সুবিধা। সেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে নিস্তার পাওয়া যায়। কারণ বড়ো নেতাদের দৈনিক বক্তব্যের ভিড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত আর অর্থহীন মন্তব্য হারিয়ে যায়।

ছ’টি সাধারণ নির্বাচনে লড়েও সারা দেশে কখনো ৫ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি তৃণমূল। বিজেপির ভোট শতাংশ ৪৩। বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ২৬ থেকে ৪৮ শতাংশে উঠেছে। দল তৈরির ১৩ বছরের মধ্যে মমতা (১৯৯৮-২০১১) ৩৮ শতাংশ ভোট পায়। বিজেপি তাই পেয়েছে ৫ বছরের মধ্যে।

মমতার ভোট কুশলী প্রশান্ত তাই আবার বলেছেন, ‘আগামী ৪০ বছরে বিজেপি রাজনৈতিক সত্য’।

বিজেপি নেতারা বলছেন বেনোজল বেরিয়ে গেলে ভালো। আপাতত উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন উতরানোর দিকে তাকিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি।

দলীয় বিবাদকে পিছনে ফেলতে পারলে বিজেপি সাফল্য পাবে বলে আমার ধারণা। ভারতীয় সংস্কৃতির আকর ‘ধৈর্য্যং কুরু’। বিজেপিকে তাই করতে হবে। রাজ্যে কংগ্রেস-বাম নিশ্চিহ্ন। তাই বিজেপির পক্ষে লক্ষ্য স্থির করা মোটেই অসুবিধার নয়। □

মারা গেলেই ভালো যতই হোক কালো

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

মৃত মানুষের নিন্দা করতে নেই জানি। কিন্তু মৃত মানুষকে চিঠি লেখা যায় কি না আর গেলেও কোন ঠিকানায় লিখতে হয় তা তো আমার জানা নেই। তাই আমার বরাবরের ভরসা আপনারা। মনের কথা লিখে জানানোর এর চেয়ে ভালো বন্ধু আমার আর কে আছে বলুন তো আপনারা ছাড়া। তাই আপনাদের কাছেই আমার প্রশ্ন, মারা গেলে কি সবাই ভালো হয়ে যায়!

কদিন আগেই মারা গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তার পরে সব সংবাদপত্র ভিজে গেল চোখের জলে। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। কিন্তু সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের যে ইতিহাস তাতে তো সংবাদপত্রওয়ালাদের চোখে জল আসার চেয়ে আগুন আসা বেশি জরুরি ছিল। না, তিনি কিছুদিন আগে তিন দশক আগের কাজকর্মের জন্য ভুল স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ভুল স্বীকার করলেই সব ঠিক হয়ে যায়! একদিন খবরের কাগজের অফিসে বসে নিজের পছন্দ মতো খবর কেটে দিতেন। এমন সময় সে কাজটা করতেন যে সাদা পাতা ছাপা ছাড়া উপায় থাকত না। বাড়াবাড়ি করা হয়ে গিয়েছিল বলে সুব্রতবাবু প্রকাশ্যেই বলেছেন, লিখেছেন। তিনিই জানিয়েছেন, জরুরি অবস্থার সময়ে একটি খবরের কাগজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' কবিতাটি ছাপাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটি বিদ্রোহের কবিতা মনে করে তিনি ছাপার অনুমতি দেননি। অনেক আবেদন জানিয়েছিলেন সেই কাগজের সম্পাদকমশাই। কিন্তু তাতে সুব্রতকে গলানো যায়নি। শেষে সে দিন প্রতিবাদে ওই কাগজের একটি পাতা সাদা রেখে ছাপা হয়।

এটাই প্রশাসক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কালো ইতিহাস। কিন্তু মৃত্যুর পরে সকলে বলেছেন কী ভালো মেয়র ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি কলকাতা পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়ির নাম রেখেছিলেন 'সুচেতনা'। অনেকে বলেন, এই নাম দেওয়ার পিছনে কারণ ছিল একটাই যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মেয়ের নামও সুচেতনা। তাঁর কার্যকালে কলকাতার বিভিন্ন পার্কের নাম বদল ছাড়া কী কী করেছেন সেটা সত্যই গবেষণার বিষয়। তবে হ্যাঁ দীর্ঘ বামজমানায় দুর্নীতির যে একচেটিয়া লাল নৈরাজ্য কলকাতা পুরসভায় তৈরি হয়েছিল সেটাকেই তিনি সবুজ করেছিলেন। আমার দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এসব জানেন। কিন্তু উনি সব মেনে নিয়েছেন। কারণ, সুবিধাবাদী সুব্রত মমতাকেও অনেক সুবিধা অতীতে করে দিয়েছিলেন। সেটা কংগ্রেসে থাকার সময়। এসব পড়ে আবার কেউ ভাববেন না যে দিদিকে খারাপ মানুষ বলছি। আমি প্রিয় দিদিভাইকে যে চোখে দেখি তাতে এসব ভাবাও পাপ। আমি শুধু যা ঘটেছে তাই বলছি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন দিদিকে রাজনীতির সামনের সারিতে নিয়ে এসেছিলেন সুব্রত। আজ যাঁরা দলবদল করে নজির গড়েন তাঁদের আদি গুরু সুব্রতই। তিনি একই সঙ্গে কংগ্রেসের বিধায়ক ও তৃণমূলের মেয়র থেকে দেখিয়েছেন। দুটি নৌকায় দু'পা রেখে কীভাবে এগিয়ে চলা যায় তিনিই দেখিয়েছেন। আবার দিদিই একদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুব্রতও গোঁসা করে ঘড়ি চিহ্ন নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ে সিপিএম-কে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। আবার একদিন দিদির লোক হয়েছেন। ইচ্ছা ছিল লোকসভায় যাবেন। দুবার সে চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু হয়নি।

কী আশ্চর্য বলুন তো সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মন্ত্রিসভায় থেকে যিনি নকশাল পিটিয়েছেন, খুন করেছেন, সন্ন্যাসীদেরও ধরে ধরে নাসবন্দি করিয়েছেন তিনিই আবার মমতা দিদিরও মন্ত্রী হয়েছেন। বামেদের সঙ্গে ওঠাবসা করে যিনি তরমুজ উপাধি পেয়েছিলেন তিনিই আবার দিদির বাম-বিরোধী রাজনীতিতে সৈনিক হয়েছেন। আসলে দিদির দরবারে এমন লোকের সংখ্যাই তো বেশি। দিদি এমনিতে ভালো কিন্তু একে ধরো, ওকে ছাড়ো-তে তিনিও ওস্তাদ। যেমন ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আর এক সহযোদ্ধা প্রয়াত সোমেন মিত্রও।

বুদ্ধি ধরতেন তিনি। একইরকম বুদ্ধি ধরতেন প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। জাতীয় কংগ্রেসে থেকেই দিল্লির হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের অনেক কংগ্রেস নেতা বিদ্রোহ করেছেন। প্রিয়-সুব্রত কংগ্রেস ভাঙেননি। সুব্রত মুখোপাধ্যায় হিসাব কষছিলেন। কারণ, এর মাঝেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হলো। জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল হলো। কিন্তু আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস ক্রমশ সবল হলো। সুব্রত জাতীয় কংগ্রেসে থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এগিয়ে দিলেন। প্রিয়-সুব্রত যা করতে পারেননি, তা করল সুব্রত-মমতা রসায়ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বের পরিচালক হলেও চিত্রনাট্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অন্যতম সুব্রত।

কিন্তু তিনি মারা গিয়েছেন। তাই অনেক কিছুই মনে রাখা যাবে না। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত সুব্রতর সুখ্যাতি করতে করতে ভুলে যাই যে, নারদ তদন্ত থেকে তাঁর নাম বাদ গেল মৃত্যুর কারণে। মাস কয়েক আগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে।

অতিথি কলম

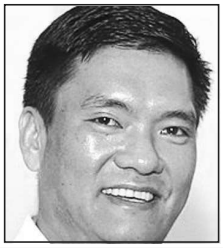

পেমা খান্ডু

বৌদ্ধ পরম্পরায় অর্জিত সম্পদে তৃপ্ত মানুষটিই ধনী

এখনই সময় বুদ্ধের প্রচারিত নালন্দা সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও বাস্তব প্রয়োগের। সে কাজে এত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জ্ঞানের যে ভাণ্ডার বৌদ্ধিক সাহিত্যে রয়েছে তা বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ করে প্রসারিত করতে পারলে এই কঠিন সময়ে বিশ্ববাসী বুদ্ধের প্রজ্ঞায় দীক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

সঠিক পবিত্র জীবন যাপনের সংকেত আমাদের কয়েক হাজার বছর আগেই দিয়ে গেছেন অমিতাভ বুদ্ধ। তাঁর আটটি নির্দেশ অনুসরণ করলে দেখা যাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সুখের সন্ধান রয়েছে আমাদের প্রয়োজন পূরণের ওপর, অপর্যাপ্ত চাহিদার ওপর নয়। এই পথে চললে আমরা পৃথিবীকে দীর্ঘকাল মনুষ্য বাসযোগ্য করে রাখতে পারব। গৌতম বুদ্ধের এই আটটি বাণী হলো—

(১) সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, (২) সঠিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, (৩) সঠিক ভাষণ বা কথাবার্তা, (৪) যথাযথ ব্যবহার, (৫) সঠিক জীবন প্রণালী তথা জীবিকা নির্বাচন, (৬) সঠিক প্রচেষ্টা, (৭) নিজের মানসিকতার ওপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ, (৮) সঠিক আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধ্যানের অভ্যাস।

এই অনুশাসনগুলির নবোত্থানের প্রয়োজন। অমিতাভ বুদ্ধের চারটি মহান সত্য অনুভব ও তাতে উত্তরণের ক্ষেত্রে আটটি পথ নির্দেশ রয়েছে। সারা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই নির্দেশগুলি দীর্ঘ ২৫০০ বছর ধরে পথ প্রদর্শকের কাজ করছে। এই সূত্রে বহু স্থানে ধর্ম ও ধম্ম একাধারে 'মহাজাগতিক আইন' বলে পরিগণিত হয়।

এখন ভগবান বুদ্ধের জীবনের বহু গল্পের মধ্যে একটি আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। একদিন বুদ্ধদেব তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতে পার একজন মানুষের জীবনের আয়ু কত?' একজনের উত্তর 'বেশ কিছু বছর'। আরেকজন জানাল, 'এই কিছুদিন মাত্র'। আর একজন বলল, 'সকালের খাওয়া থেকে রাতের খাওয়া পর্যন্ত'। সব শোনার পর বুদ্ধ বললেন, 'জীবন একটি নিশ্বাস থেকে পরবর্তী নিশ্বাসের মধ্যেই শেষ হয়। তোমরা মনে রাখ, একটি মাত্র নিশ্বাসেই জীবন ও মৃত্যুর ফারাক'।

দেখুন, সম্প্রতিক কোভিড মহামারী কি আমাদের জীবন নিয়ে শেখায়নি একটি নিশ্বাসের গুরুত্ব কী অপরিসীম? বিগত দু' বছর ধরে সারা বিশ্ব মহামারীজনিত বিপুল দারিদ্র্য চাক্ষুষ করেছে। আমরা বহু আপনজনকে হারিয়েছি। একই সঙ্গে এই দু' বছরে আমরা আরও বেশি করে অন্তর্মুখী হয়েছি, ভেবেছি। এই মহামারী একইসঙ্গে আমাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে একত্রে বাঁচা বা নিছক বেঁচে থাকার মধ্যে কত আনন্দ রয়েছে তা উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। এই করোনার সময় মহামহিম দলাই লামা তাঁর ভাবনাসূত্রকে আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সৃষ্টির তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক বন্ধন ও সময়ের সঙ্গে তার বিন্যাসও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিশ্বব্যাপী এই ধ্বংসের কারণ হিসেবে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ ও জরার উল্লেখ করেছেন। আর এই জরা বা ব্যাধি (করোনা) আজ আমাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। একই সঙ্গে তাঁর অনুভবে উঠে এসেছে মানুষের অসামান্য সহ্যশক্তি ও বিপদ মোকাবিলার ক্ষমতার কথা। বেঁচে থাকার এক অদম্য প্রাণশক্তি রয়েছে সকল জীবিত প্রাণীর মধ্যে, বলেছেন দলাই লামা।

বিশেষ করে মানুষ তার প্রাচীন অধীত বিদ্যা ধম্ম বা ধর্মের নির্দেশ অনুসরণ করে সকলে দুর্দিনের সঙ্গে সমরে একত্রিত হয়েছে। তারা সফলভাবে প্রয়োগ করেছে ancient wisdom বা প্রাচীন প্রজ্ঞা। সমগ্র বৈজ্ঞানিক শ্রেণী একজোট হয়ে এগিয়ে এসে রেকর্ড সময়ে সমগ্র মানবজাতির হাতে তুলে দিয়েছে জীবনকাঠি, যার নাম 'টিকা'। এটিই বিশ্বমানবের বিশালত্ব। সেই কারণে আমাদের ধম্ম ও ধর্মের পরম্পরা কোভিড-পরবর্তী বিশৃঙ্খল এই পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে সেই প্রাচীন পথকেই আদর্শ করতে হবে। যাতে কোভিড-পরবর্তী একটি সুন্দর পৃথিবীর পুনর্নির্মাণ হয়।

গৌতম বুদ্ধ যে আটটি অভ্রান্ত পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন করোনা পরবর্তী বিশ্বের ক্ষমতা বিন্যাসে সে পথই যে অনুসৃত হচ্ছে

তার পর্যাপ্ত প্রমাণ ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। এক দেশের টিকা মানব কল্যাণে কী অক্লেশে আর এক দেশে চলে যাচ্ছে। এটা কি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক পথ অনুসরণ ও সঠিক মননের বুদ্ধ নির্দেশিত পথ অনুসরণ নয়?

ভারতের এক সাধু-দার্শনিক নাগার্জুন আমাদের সন্ধান দিয়েছিলেন মধ্যপন্থার। সারা বিশ্বকে তিনি মধ্যপন্থার যে আলোকবর্তিকা দেখিয়েছিলেন তা থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়ে আমি বলতে চাই বিশেষ করে সঠিক জীবনযাপন ও জীবিকার কথা। কোভিডোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্বের নীতি নির্ধারক রাজনীতিকরা বিশ্বকে মানুষের পক্ষে উপযোগী করার অঙ্গীকার করছেন। গ্লাসগোতে সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটি সম্মেলন হয়েছে যা সিওপি-২৬ নামে পরিচিত। সেখানে বিশ্বনেতারা এই মা ধরিত্রীকে আরও বাসযোগ্য ও দীর্ঘদিন টিকে থাকার জন্য যে যে পদক্ষেপ নিতে হবে তার অঙ্গীকার করেছেন। তারা বিশ্বের উষ্ণায়ন আটকানো, দুর্বলতম সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দেওয়া ও প্রকৃতিকে আঘাত না করার শপথ নিয়েছেন। এই কাজে অর্থের জোগান থেকে সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যে তাঁরা মিলিতভাবে একে অপরের মত বিনিময়ের মাধ্যমে নেবেন সে কথাও বলেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সিওপি-২৬ সম্মেলনে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের ভাবতে হবে চারটি অক্ষর নিয়ে— 'LIFE'। যার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। বাঁচার পরিমণ্ডলে পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি আহ্বান করেছেন এই 'Life style for enviornment' বা LIFE-কে একটি বিশ্ব আন্দোলনে রূপায়িত করা প্রয়োজন। যেখানে প্রত্যেক মানুষ হবে পরিবেশ সচেতন।

তিনি জোর দেন মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলির কেবলমাত্র প্রয়োজনানুগ প্রয়োগ ও ব্যবহারের ওপর। তাদের যথেচ্ছ ধ্বংস করা অর্থাৎ আমাদের চরম ভোগবাদী মানসিকতা সফল করতে উচ্ছৃঙ্খল ও ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ নষ্ট করা মেনে নেওয়া যাবে না।

এই মর্মে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ মানবজীবন ও সামগ্রিক বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন ও সমাধানে এতটাই দায়বদ্ধ ও আন্তরিক ছিলেন যে তিনি অভাবিতভাবে ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতকে কার্বন মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটিই বুদ্ধ প্রদর্শিত রাইট অ্যাসপিরেশন বা সঠিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই সূত্রে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে একটি পঞ্চামৃতের সূত্রও উপস্থাপিত করেন যা এই কার্বন বিষ থেকে বিশ্বকে আগামীদিনে মুক্তি দিতে পারে। তাঁর দেওয়া এই আন্তরিক প্রতিশ্রুতি কিন্তু বাস্তবায়িত করা কষ্টসাধ্য কাজ। আর তা করতে গেলেই বুদ্ধ ও মোদীর উল্লেখিত রাইট লাইভলিহুড বা সঠিক জীবনযাপনের নির্দেশই আমাদের অনুশীলন করতে হবে। আমি যে অরুণাচল অঞ্চলের মানুষ সেখানে মূলত ২৬টি বড়ো মাপের উপজাতির বাস। আমাদের ৮০ ভাগ ভূমিই অরণ্যানীতে ভরা। যা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। সকলেই জানবেন আমাদের জনজাতির মানুষরা তিনটি জিনিসেরই সর্বাধিক মূল্য দেয়— জল, জমি ও জঙ্গল। আর এই তিনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়েই তারা সুন্দর একাত্ম জীবনযাপন করে। সকলকে বুঝতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য ও সঠিক মেলবন্ধন করেই আমাদের জীবনযাপনের দিকনির্দেশ স্থির করতে হবে। সমাজের উন্নয়নের সঙ্গে প্রকৃতির সংরক্ষণই হবে মেলবন্ধনের মন্ত্র। এই সূত্রে অরুণাচলের মতো প্রদেশ যেখানে কার্বন নিঃসরণ হয় না কেননা নদী ও বনভূমি সেখানে অটুট, তাকে ছোটো করা যায় না। সেখানকার লোকেরা যে খুশি আগেই বলেছি। আর বুদ্ধ বলেছিলেন সত্যিকারের পরিতৃপ্তি ও সুখ আছে কেবলমাত্র প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে, অপরিমেয় চাহিদার নিবৃত্তিতে নয়।

সাফল্য আসবে চাহিদার পরিহার্যতায়, যেন তেন প্রকারেণ তা আহরণের মধ্যে দিয়ে নয়। কামনার নিঃশেষেই সুখ তাতে অগ্নিসংযোগে নয়। সেই মানুষটিই ধনী যে তার অর্জিত সম্পদেই পরিতৃপ্ত। সঠিক জীবনযাত্রার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোন কাজটি করলে নিজের, অপরের ও আমাদের এই বিশ্বের সামগ্রিক মঙ্গল হয়।

তাই বলছি এখনই সময় বুদ্ধের প্রচারিত নালন্দা সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও বাস্তব প্রয়োগের। সে কাজে এত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জ্ঞানের যে ভাণ্ডার বৌদ্ধিক সাহিত্যে রয়েছে তা বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ করে প্রসারিত করতে পারলে এই কঠিন সময়ে বিশ্ববাসী বুদ্ধের প্রজ্ঞায় দীক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

(নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ)

(লেখক অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী)

With best compliments from -

RAMESH TRADING CO.

24, N. S. Road

3rd floor, Room no. 25

Kolkata - 700 001

Mob. - 9830006459 / 8240911315

বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধি বিরোধীদের রোষ

বিশ্বামিত্র

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে যে, এবার থেকে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার পঞ্চাশ কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত সীমা সুরক্ষা বল অর্থাৎ বিএসএফের নজরদারি চলবে। এতদিন পর্যন্ত সীমানার অভ্যন্তরে পনেরো কিলোমিটার অবধি বিএসএফ-এর টহলদারি চলতো। হঠাৎ করে কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্ত কেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, সীমান্তে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্ম রুখতেই বিএসএফের টহলদারির সীমানা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিরোধীরা সচরাচর গত সাড়ে সাত বছরে যে আচরণ করে এসেছে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তারা অকারণে এর মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনছে। বিরোধীদের মূল অভিযোগ, নজরদারির এই সীমানা বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নাকি আঘাত হানা হচ্ছে, রাজ্যের অধিকারে কেন্দ্র অন্যায্যভাবে নাক গলাচ্ছে ইত্যাদি। এনিয়ে সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে অশান্তি করার, যেমন অধিবেশন অচল করে দেওয়া, আন্দোলনের নামে পথেঘাটে অভব্যতা, অশান্তি করে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করা ইত্যাদিরও পরিকল্পনা রয়েছে বিরোধীদের। অথচ কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র তিনটি অঙ্গরাজ্যের ওপর প্রযুক্ত হবে; যে রাজ্যগুলোর সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা আছে অর্থাৎ পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম। জম্মু-কাশ্মীর ও অরুণাচল-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে যদিও পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত আছে, কিন্তু সেগুলো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় কেন্দ্রের সাম্প্রতিকতম বিএসএফ-সংক্রান্ত নির্দেশনামায় তা অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-শাসিত পঞ্জাব বিধানসভা ও তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা প্রস্তাব এনে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিএসএফের বিবৃতি বিশেষ তাৎপর্যের। বিএসএফ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তাদের এক্তিয়ার বাড়ানো হয়েছে মানে তা কখনোই রাজ্যের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করবে না। কারণ বর্ধিত সীমানায় বিএসএফের এফআইআর করারও অধিকার থাকছে না। তারা শুধু টহলদারি চালাবে। অর্থাৎ রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার যে অভিযোগ তুলছিল বিরোধীরা, তা নেহাতই ভিত্তিহীন বলে বিএসএফের দাবি। আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিরোধীরা কখনোই সরকার পক্ষের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। সরকার পক্ষের সঙ্গে ভিন্নমত হওয়াটা বিরোধীদের নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তারা যেভাবে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিপজ্জনক ভাবে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে দেশের স্বার্থকে বিপন্ন করছে, পৃথিবীর বৃহত্তর গণতন্ত্রে তা কখনোই কাম্য নয়। সম্প্রতি চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী অপর্ণা সেন এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমর্থন করে সীমান্ত এলাকায় 'মানবাধিকার' রক্ষা করার কথা বলেছেন।

মূলত তাঁর এই বক্তব্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বিরোধীদের আসল উদ্দেশ্য, তাদের মনের কথা। যে তিনটি রাজ্যে বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধি হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম অনুপ্রবেশ কবলিত। মূলত দেশভাগের সময় নেহরু-জিন্না চুক্তি অনুযায়ী জনবিনিময় না হওয়ার জন্য। সেদিক দিয়ে পঞ্জাবে অনেকাংশে জনবিনিময় হলেও সে রাজ্যে সীমান্ত সন্ত্রাস পূর্ণমাত্রায় বলবৎ। আর পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে সীমান্ত-সন্ত্রাসের সঙ্গে বড়ো মাথাব্যাথার কারণ চোরাচালান, গোরুপাচার ইত্যাদি। এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, অনুপ্রবেশকারীরা বহু বছর ধরেই এই বিরোধী-শিবিরের ভোটব্যাঙ্ক। বিরোধী রাজনৈতিক শিবির বহুধাবিভক্ত হলেও তাদের ভোটব্যাঙ্ক মূলত একই। সেই কারণেই এবছর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম যখন আইএসএফের সঙ্গে জোটে গেল তখন জোটের অন্যতম শরিক কংগ্রেস তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কারণ কংগ্রেসের ঘাঁটি মালদা, মুর্শিদাবাদ; আরও ভালোভাবে বললে মালদা, মুর্শিদাবাদের তথাকথিত সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক, যার সিংহভাগই অনুপ্রবেশকারী, তাতে ভাগ বসাতো আইএসএফ। তাই তাদের সঙ্গে জোট করতে এত অনীহা ছিল কংগ্রেসের।

মনে রাখা দরকার, মমতা যখন বিরোধী নেত্রী, তখন এব্যাপারে তিনি সরব হয়েছিলেন সংসদে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাগজ পর্যন্ত ছুঁড়ে মেরেছিলেন, লোকসভার তৎকালীন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। এখন ক্ষমতায় এসে তিনি পাল্টি খেয়েছেন, অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। আর তাই রাজনৈতিক পাশাখেলায় দান উলটে গেলেও, অনুপ্রবেশ সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে অনুপ্রবেশ-সমস্যার জন্মদাতা কংগ্রেস-বামেরা তাদের মমতা-বিরোধিতা ভুলে এব্যাপারে মমতার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। অপর্ণা সেনের 'মানবাধিকারে'র কথা এক্ষেত্রে মনে পড়েছে, কারণ অনুপ্রবেশকারীদের অর্থাৎ বাংলাদেশী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তি যাচ্ছে বলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের কাছে হিন্দুদের 'মানবাধিকারে'র প্রশ্ন কিন্তু উপেক্ষিতই থেকে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই সিএএ, এনআরসি লাগুর প্রয়োজনীয়তা এখন খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে। দেশের সুরক্ষায় ভারত সীমান্তে বিএসএফের এক্তিয়ার বাড়িয়েছে কেন্দ্র, এবার হিন্দুদের সুরক্ষিত করতে এনআরসি, সিএএ লাগু হোক। □

ভাড়াটে সেনা দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না

অভিমন্যু রায়

এই লেখা শুরু করব তিনটে গল্প দিয়ে। প্রথম গল্প নিউইয়র্কবাসী কুলদা রায়ের ফেসবুক পোস্ট থেকে পাওয়া। সে পোস্টে আছে একদা খুলনাবাসী গীতারানি সমাদ্দার নামে এক মহিলার স্মৃতিচারণ। গীতারানির বর্তমানে বয়েস ৭১ বছর। গীতা তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

'১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহ। মোটে ৯ মাস বিয়ে হয়েছে। ভালোই আছি। একদিন হঠাৎ স্বামী হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। অত বড়ো বাড়িটায় একটা চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের হজরত বাল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের চুল চুরি হয়ে গেছে।

তাতে আমাদের কী! জম্মু-কাশ্মীরের চোর চুরি করেছে, পুলিশের কাজ চোর ধরা। আমরা তো হাজার মাইল দূরে আছি।

পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী সবুর খান খুলনার লোক। উনি মিটিং ডেকে বললেন— হজরত মহম্মদের চুল চুরি করেছে হিন্দুরা। এটা ওদেরই চক্রান্ত। আমাদের বাড়ির পুরুষেরা কেউ ভয়ে বাইরে গেল না কদিন। শোনা গেল সবুর খান মিটিং করছেন বহু জায়গায়। সবখানেই এক কথা, হিন্দুদের খতম কর। চারদিন বাদে খুলনা শহরে মুসলমানরা শোক মিছিল বের করল। আমরা দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছি। খালিশপুর-দৌলতপুর অঞ্চল থেকে তারা লরিতে করে খুলনা শহরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দু এলাকার উপর। খুলনার লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, বাজার, রাস্তাঘাটে প্রাণ হারাল শত শত মানুষ। সব হিন্দু পাড়া লুটপাট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তার সঙ্গে সমানে চলল নারী ধর্ষণ ও অত্যাচার।

খুলনার সুপ্রাচীন কালী মন্দিরের কালী মূর্তিটি ভেঙে চুরমার করে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দিল। খুন করে ফেলল মন্দিরের সেবাইতদের।

শনিবার জানা গেল, হজরত মহম্মদের কেশ ফিরে পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে কোনো হিন্দু জড়িত ছিল না।'

দ্বিতীয় গল্প ঢাকার খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক সালাম আজাদ সাহেবের 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। সে প্রবন্ধে ভয়ংকর একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন সালাম আজাদ। ১৯৮৭-৮৮ সালের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার নিদারাবাদ গ্রামে। সে গ্রামে দেবনাথ তার স্ত্রী বিরজাবালা, তিন ছেলে সুভাষ (১৩), সুমন (৭), সুজন (৩) ও দুই মেয়ে মিনতি (১৭) এবং প্রণতিকে (১১) নিয়ে বাস করতেন। শশাঙ্কবাবুর কিছু জমি ছিল। সে জমি চাষ করে শশাঙ্কবাবুর সংসার মোটামুটি চলে যেত। ওই গ্রামের এক মুসলমান প্রতিবেশীর নজর পড়ে শশাঙ্কবাবুর জমির উপর। ভালো কথায় জমি লিখে দিয়ে

মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়। ভাড়াটে সেনা আর ভাড়াটে মতবাদ নিয়ে আর যাই হোক যুদ্ধ জয় হয় না।

ভারতে চলে না যাওয়ার পরিণামে 'বেয়াড়া' শশাঙ্কবাবু দুম করে খুন হয়ে যান ১৯৮৭ সনের ১৬ অক্টোবর, কালী পুজোর তিনদিন আগে। পাঁচ নাবালক সন্তানকে নিয়ে অথৈ জলে পড়ে যান বিরজাবালা। খুনিদের হুমকি ধমকি উপেক্ষা করে তিনি কিছুদিন টিকেও থাকেন। শেষে ১৯৮৮ সালের ৫ মার্চ ঘটে সেই রোমহর্ষক ঘটনা। সেদিন মধ্যরাতে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পাঁচ সন্তান-সহ বিরজাবালার চোখ মুখ বেঁধে ফেলে আততায়ীরা। নৌকায় তুলে বাড়ি থেকে দু' কিলোমিটার দূরে ধোপাবাড়ির নির্জন বিলে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেককে হত্যা করে। তারপর দেহগুলি টুকরো টুকরো করে ড্রামে ভরে জলের গভীরে ডুবিয়ে দেয় প্রতিবেশী তাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, নজরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান ও ইনু। গ্রামে ফিরে প্রচার করে দেয় বিরজাবালা ভারতে চলে গেছে।

পরের গল্পটি সাম্প্রতিক। সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট সূত্রে প্রায় সবাই সে গল্প জানেন। বাংলাদেশের প্রথম সারির এক সংবাদপত্র এই ঘটনাটির সরেজমিন খবরাখবর করেছে। সে সূত্রে ঘটনাটির খুঁটিনাটি কিছুটা জানা গেছে। গল্পটি কুমিল্লার নানুয়ার দিঘির পাড়ের দুর্গাপূজা সংক্রান্ত। অনেকদিন ধরেই নানুয়ার দিঘির পাড়ে পূজা হয়ে আসছে। এই অঞ্চলের প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ হিন্দু। ১২ অক্টোবর সপ্তমী পূজার কাজকর্ম শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে যায়। পূজার সঙ্গে জড়িত মানুষেরা রাত দুটো নাগাদ মণ্ডপ ছেড়ে যান। রাত পোহালেই অষ্টমী পূজার জন্য আবার আসতে হবে তাদের। পরদিন সকাল ৭টা নাগাদ দেখা গেল স্থানীয় তরুণ এক্রাম হোসেন পূজা মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করছে। ফোন পেয়ে কোতোয়ালি থানার দারোগাবাবু সাধারণ পোশাকেই মণ্ডপে ছুটে আসেন। তিনি দেখতে পান মণ্ডপে গণেশ মূর্তির কোলে

ফঃ ২

পবিত্র কোরান রাখা আছে। তিনি যখন এই গ্রন্থটি সরাবার ব্যবস্থা করছেন তখন আরেক স্থানীয় যুবক মহম্মদ ফয়েজ তার মোবাইলে ঘটনাটি ফেসবুক লাইভ করতে শুরু করে দেয়। এর কিছুক্ষণ পরেই একদল যুবক পূজা মণ্ডপে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। মোবাইলে মোবাইলে খবর ছড়িয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর মুসলমান, যাদের বেশির ভাগই অল্পবয়েসি, পাশের দিঘির জলে কাঠামো-সহ প্রতিমাটিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কিন্তু লাগামহীন জেহাদি বাহিনী কুমিল্লার আরও অনেক স্থানে মণ্ডপ অপবিত্র করে, মন্দিরে হামলা করে, হিন্দুদের যাদের হাতের কাছে পায় পিটিয়ে দেয়।

কুমিল্লার এই ঘটনা শুধু কুমিল্লাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দু'দিনের মধ্যে বাংলাদেশের অন্তত ২২টি স্থানে হিন্দু মন্দির, মণ্ডপের উপর হামলা হয়। মোট ৮ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। বহু হিন্দু আহত। হাজিগঞ্জে একই পরিবারের তিনজন নারী ধর্ষিতা হয়েছেন বলে খবর।

বিভিন্ন সময়কালের যে তিনটি ঘটনার গল্প বললাম সেগুলি নিছক প্রতিনিধিত্বমূলক। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্মিলিত সংস্থার হিসাব মতো দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক এমন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যা পেনাল কোড অনুযায়ী সিরিয়াস ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেস থানা পর্যন্তই থেকে যায়। বিচার খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। শাস্তির সংখ্যা তো খুবই নগণ্য। পরিণামে অপরাধ বেড়েই যেতে থাকে। অসহায় সংখ্যালঘুরা মুখ বুজে মার খায়, নয়তো ভারতে পালিয়ে আসে।

বাংলাদেশের ধর্মগত জনবিন্যাসের পরিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে যে কোনও অন্ধও বলে দেবে যে সে দেশে আসলে কী ঘটে চলেছে। *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শচী দস্তিদার বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও তার পরিবর্তনের স্বরূপের উপর যে গবেষণামূলক কাজ করেছেন তাতে তিনি দাবি করেছেন যে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত মোট ৪.৯০ কোটি হিন্দু বাংলাদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

হিন্দু জনসংখ্যার এই হারিয়ে যাওয়ার উপর কাজ করেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আবুল বরকতও। তিনি গবেষণা করে জানিয়েছেন ১৯৬৪ থেকে ২০১৩-র মধ্যেকার ৪৯ বছরে এক কোটি তেরো লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেছে। তার হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। তার ভবিষ্যৎবাণী এই 'ছেড়ে যাওয়া' চলতে থাকলে আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে কোনও হিন্দুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

অজয় কুমার তীর্থ এক হিন্দু যুবক। বরিশালের পটুয়াখালীতে বাড়ি। ঢাকায় রেডিয়ো ইমেজিং এবং টেকনোলজিতে বিএসসি পড়ছে। গত ১৯ অক্টোবর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার আকুল প্রশ্ন, 'এই দেশে আমাদের ভবিষ্যৎ কী?' অজয়দের চৌদ্দপুরুষ বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করে আসছে। এখন তার মনে হচ্ছে সে এই দেশের কেউ না। উৎকণ্ঠিত অজয় বলে, 'এখানে আজ পর্যন্ত যত সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে তার একটিরও আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি। মূলত বিচারহীনতার সংস্কৃতি, লেখক বুদ্ধিজীবীদের নীরবতার কারণে এদেশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ক্রমবর্ধমান মৌলবাদীদের আস্ফালন। আমাদের মিডিয়া একপেশে, তাই আমাদের নির্যাতিত হবার খবর বিশেষ কেউ জানতে পারে না।'

গীতারানি, সালাম আজাদ, শচী দস্তিদার, ড. আবুল বরকত, অজয় তীর্থ আর বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য যা এই নিবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে কোনোটাই মিথ্যে নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে, এটা শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তব। কিন্তু কোনও প্রতিকার নেই। সব চলেছে এক তরফা। এটা ঘটনা— ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গে কোটি কোটি বাঙ্গালি, অবাঙ্গালি হিন্দু বৌদ্ধ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিছু গেছে দণ্ডকে, কিছু ভারতের অন্যান্য প্রান্তে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো পালিয়ে আসা মানুষেরা এদেশে এসে অতীত ভুলে গেছে। তারা তাদের এই পলায়নের কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়নি। প্রতিকারের চেষ্টা করেনি। পেছনে ছেড়ে আসা ভাই-বোনদের জন্য বিন্দুমাত্র ভাবেনি। তাই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়।

বাংলাদেশে যখনই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে এদেশে মৃদু প্রতিবাদ ওঠে। দু' চারটা মিছিল ডেপুটেশন হয়। আজকাল অবশ্য কিছু বেশি হচ্ছে। এবারের ঘটনায় দেখা যাচ্ছে অনেকেই মুখ খুলছেন। প্রচুর মানুষ পথে নেমেছেন। ত্রিপুরায় বাম প্রভাব কম হওয়াও হয়তো এর একটা কারণ। বামেদের জমানায় কিল খেয়ে কিল হজম করার পলিসি ছিল। কারণ প্যালেস্তাইন, ভিয়েতনামের দুঃখে কেঁদে, আর কিউবায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত গলা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে কিছু বলার দম পেত কোথায়। আর হিন্দু-বৌদ্ধের দুঃখ কি কোনও দুঃখ নাকি! এসব নিয়ে কথা বলা পিওর সাম্প্রদায়িকতা। দাস ক্যাপিটালে হয়তো এমনই লেখা আছে।

তবে কি এমনই চলবে? আর ঘটনা ঘটলেই খানিক চেঁচামেচি করে বাকিরা তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করবে? চোখে চোখ রেখে কেউ রুখে দাঁড়াবে না? কেউ বলবে না এ চলতে পারে না। নিরীহ আইন মেনে চলা একটি জাতিগোষ্ঠীকে এভাবে শেষ হয়ে যেতে দেওয়া যায় না। জাতি নিশ্চিহ্ন-করণের দায়ে দোষীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু সর্বপ্রথম সংগঠিত হতে হবে আক্রান্তদের। প্রতিরোধে হাতে হাত রেখে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়। ভাড়াটে সেনা আর ভাড়াটে মতবাদ নিয়ে আর যাই হোক যুদ্ধ জয় হয় না। ▮

ক্রুসেডের আগে বিজ্ঞানে গ্রীকদের কোনও অবদান ছিল না

পিন্টু সান্যাল

একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আধুনিক ইতিহাসের গতি প্রকৃতি কয়েক শতাব্দীর ঔপনিবেশিকতার দ্বারা প্রভাবিত। আমরা পৃথিবীকে এমনকী নিজের দেশকেও যেভাবে দেখি বা দেখতে বাধ্য হই তা অনেকটাই নির্ভর করে পশ্চিমী জ্ঞানের উপর। অনেকে বলেন উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই আজ বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক ধারাকে সুগম করার নিদর্শন ইতিহাসে বিরল। বরং বিশ্বের ইতিহাসে বিজয়ীর পরাজিত শক্তির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতির গতি অবরুদ্ধ করার উদাহরণ প্রচুর। বিপক্ষের যুক্তিকে মান্যতা দেওয়ার উদারতা, সেই মহৎ দর্শন ভারতবর্ষের বাইরে কি কখনো উচ্চারিত হয়েছে?

পুরাতন সভ্যতাগুলির রুদ্ধদ্বার ইউরোপীয় শক্তি ভেঙে দিয়ে অধুনিকতার যুগ এনেছে একথা কতটা সত্য আর ঘরে যদি অন্ধকার থাকে, বাইরের আলোর জন্য জানালা ভেতরের প্রয়োজনেই ভেতর থেকে খুলে দেওয়া হয়—বাইরের তীব্র ঝোড়ো হাওয়া জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করলে তা ভেতরের প্রয়োজন না মিটিয়ে ঘরের পরিবেশকেই বিষম করে তোলে। পৃথিবীর সমস্ত সংস্থা, শিক্ষার পাঠক্রম, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যাকে বোঝা এবং সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত।

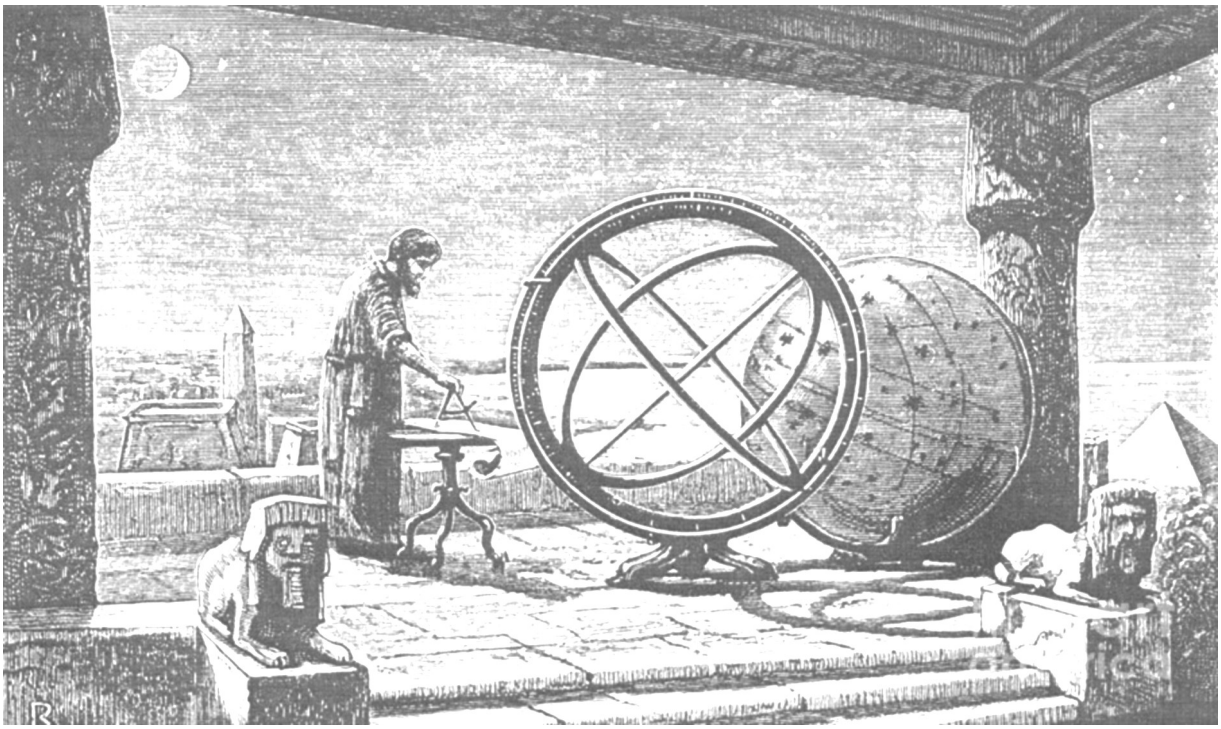

অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা ইউরোপীয় দর্শন। উন্নয়নশীল দেশ যে সময়ে ইউরোপীয় চিন্তায় অর্থনৈতিক উন্নতিতে একটু অগ্রসর হয়, উন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নতির অন্য এক উচ্চতর সোপানে পৌঁছে যায় এবং এই দৌড় চলতেই থাকে। এই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক উন্নতির তত্ত্ব উন্নয়নশীল দেশের নিজেদের জীবন পদ্ধতিকে হীন দৃষ্টিতে ভাবতে শেখায় এবং ইউরোপীয় জীবন পদ্ধতিকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে। চিন্তার জগতে এ একধরনের ঔপনিবেশিকতা নয় তো কী? তাই এই মুহূর্তে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্থা সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষার বিষয়ের উপর ঔপনিবেশিকতার প্রভাব জানা সবথেকে বেশি জরুরি— যদি আমরা সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাই।

বাণিজ্যিক স্বার্থে ও নিজেদের সংস্কৃতি, উপাসনা পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকাতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে প্রায় ৫০০ বছর আগে থেকে এবং তার পরের প্রায় ২০০ বছর স্থানীয় পুরাতন সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে ঔপনিবেশিকতা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে।

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে পুরাতন সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর তাঁর 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন..... ''আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটিয়াছে ইউরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা খ্রিস্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মুলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই—তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।''

দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গোতে ইউরোপিয়ানদের অধীনে কৃষ্ণাঙ্গরা অত্যাচারিত হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজরা ভারতবর্ষের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে যার মেকলীয় প্রভাব থেকে আমরা এখনো যে মুক্ত হতে পারিনি তা সর্বজনবিদিত। শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি, উপাসনা পদ্ধতির প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে বিভিন্ন পন্থায়। শিক্ষাক্ষেত্রের এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের এতো গভীরে ঔপনিবেশিকতা প্রবেশ করেছে যে তা খুঁজে বের করাই একরকমের গবেষণা।

ঔপনিবেশিকতার সুফল বলতে গিয়ে বলা হয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউরোপীয়দের অবদান। নিঃসন্দেহে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে ইউরোপীয় প্রভাব অনস্বীকার্য কিন্তু এর সুফল-কুফল নিয়ে আলোচনার কি প্রয়োজন নেই? ইউরোপের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতাগুলোর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য যে ব্যবস্থাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সেই পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতিগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলে কী হতে পারতো বা যে শিক্ষা পদ্ধতি ও সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো ইউরোপের আধুনিকীকরণে তার কোনো অবদান আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর কি খোঁজার চেষ্টা হয়েছে? ঔপনিবেশিকতার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলো কি শুধুই জমি দখল করেছে না আরও অনেক কিছু পেয়েছে যা তারা অস্বীকার করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে বাঁচিয়ে রাখতে?

আমাদের এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো সভ্যতার জয়যাত্রা জ্ঞান, বিশেষত বিজ্ঞানের সমান্তরাল অগ্রগতি ছাড়া হতে পারে না। এ দেশে ইংরেজরা ভারতবর্ষের সামাজিক, শৈক্ষিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে; ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে জেনেছে, প্রচুর সংস্কৃতে লিখিত বই অনুবাদ করেছে। ভারতবর্ষকে জেনে শিক্ষাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় পদ্ধতিকে সরিয়ে ইউরোপীয় পদ্ধতির প্রসার করেছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধের কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য..... ''বস্তুতঃ এ কথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয়—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে, তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে। সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মতো জেলে দিতে ডেপুটি, সাবডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট-বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানি—তার শিক্ষাবিধানের বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি আমরা তাই শুধু ভাবি।''

'শিক্ষা'-কে পরাধীন জাতি কে নিয়ন্ত্রণের এক পন্থা, তার সংস্কৃতি কে ধ্বংস করার এক মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন করতে তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা বিশেষ এগোয়নি।

শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'ইতিহাস' ও 'বিজ্ঞান' দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'ইতিহাস' বিকৃত করে উপস্থাপিত করে কীভাবে একটি জাতির মনে তাঁর আপন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবজ্ঞা ভরে দেওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা প্রায়শই হয় কিন্তু 'বিজ্ঞান'-কে এবং 'বিজ্ঞানের ইতিহাস'-কে ব্যবহার করেও যে পরাধীন জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা যায় তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।

আজ এ কথা স্বীকার করতে হবে যে 'বিশ্বায়ন' হয়েছে ইউরোপীয় চিন্তার, ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির ও ইউরোপীয় 'বিজ্ঞান' এর। ইউরোপীয় 'বিজ্ঞান' কথাটি অনেককেই বিস্মিত করতে পারে। 'বিজ্ঞান' একটি সর্বজনীন বিষয়, তার আবার কোনো দেশ, কোনো সংস্কৃতির উপর নির্ভরতা কি থাকতে পারে 'বিজ্ঞান' যদি দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল না হয় তাহলে 'বিজ্ঞান' এর ক্ষেত্রে 'আধুনিক' বিজ্ঞান ও প্রাচীন 'বিজ্ঞান' এই প্রভেদ থাকে কেন? ভারতীয় 'গণিত' প্রাচীন আর ইউরোপীয় 'ম্যাথামেটিক্স' আধুনিক? ভারতবর্ষের রসায়ন 'হিন্দু কেমিস্ট্রি', জ্যোতির্বিজ্ঞান 'হিন্দু এস্ট্রোনমি' এবং গণিত 'হিসাব-আল-হিন্দ'।

'আধুনিক' বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা ইউরোপে এমনটি ভাবার কী কারণ? আমরা এ কথা প্রায়ই শুনে থাকি অমুক মতবাদ বা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ বিজ্ঞান আছে মানেই তার পেছনে একটা অকাট্য যুক্তি আছে। তাহলে কি এই আশঙ্কা মনে জাগতে পারে না যে, ইতিহাসের কোনো এক সময়ে কোনো মতবাদ, কোনো সংস্কৃতিকে মানবমনে জায়গা করে দিতে 'বিজ্ঞান'-এর 'সংজ্ঞা' কেই পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে সুবিধামতো? এমনকী হয়েছে আপন সংস্কৃতির ছাঁচে ঢেলে 'বিজ্ঞান'কে বিশ্বের সামনে উপস্থাপনা করা হয়েছে যাতে করে কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতি 'বিজ্ঞান' এর নামে নিজেকে অবৈজ্ঞানিক মনে করে বদলে নিয়েছে? ভারতবর্ষের দিকে তাকালে শেষ প্রশ্নের উত্তরটি পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

'বিজ্ঞান' কি তাহলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের, আপন উপাসনা-পদ্ধতি (Religion) প্রসারের এক হাতিয়ার? 'বিজ্ঞান'-কে কি মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে এ পদ্ধতির ইতিহাস আমাদের জানতে হবে, নাহলে এই আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আমাদের শেখানো হয়েছে 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা আজ যা বুঝি তা ইউরোপের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং 'বিজ্ঞান'-এর যে কোনো বিষয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল গ্রিসে কয়েক শতাব্দী পরে নবজাগরণের সময় ইউরোপে। কিন্তু এই দাবির স্বপক্ষে কি কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে?

'বিজ্ঞান'-এর বিষয়গুলো পড়ার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের সামনে বিভিন্ন গ্রিক নাম চলে আসে। যেনো গ্রিক সংস্কৃতিই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের জন্ম দিয়েছে এবং নবজাগরণের পরে ইউরোপে সেই জ্ঞান বিকশিত হয়েছে আর বাকি বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে যেনো কোনো ধারণাই ছিল না। ব্রিটিশ ম্যাথামেটিশিয়ান (Mathematician) Rouse Ball 'A short account of history of mathematics'-এ বলেছেন 'The history of mathematics can not with certainty be traced back to any school or period

before.....the....Greeks..... though all early races.....know something of numeration.....and.....founded only on....obsevation and experiment, and were neither deduced from not did they form part of any science. অর্থাৎ গণনা ও জমি জরিপ করার পদ্ধতি জানা থাকলেও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কোনো অঙ্ক জানতো না। জানতো কারা? শুধু গ্রিকরা।

আর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত নিয়মকে অঙ্ক বা বিজ্ঞান বলা যাবে না যদি না সেটা কোনো law থেকে deduced হয়। অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত নিয়মের থেকে কোনো law থেকে পাওয়া deduction 'বিজ্ঞান' হিসেবে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং শুধুমাত্র গ্রিকরা deduction জানতো। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার থেকে 'Deduction' কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান সাধনার মিশরীয়, ভারতীয় পদ্ধতিকে অস্বীকার করে গ্রিক তথা ইউরোপীয়দের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়। ভারতবর্ষকে অস্বীকার করে গ্রিসকে এক উৎকৃষ্ট সভ্যতা হিসাবে তুলে ধরাতে ইউরোপের কোন স্বার্থ কাজ করছে?

রাজনৈতিক ইতিহাসের তুলনায় বিজ্ঞানের ইতিহাসের দ্বিচারিতাকে তুলে ধরা একটু কঠিন, কারণ প্রথমত, বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে যে মিথ্যাচার সম্ভব এটা বিজ্ঞানচর্চা যারা করেন না তাদের বোঝানো মুশকিল আর যারা বিজ্ঞানচর্চা করেন তারা বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে আগ্রহ দেখান না। 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্কুল-পাঠ্যে যা তুলে ধরা হয় এবং বিজ্ঞানের যে ইতিহাস পড়ানো হয় সেটাই তার শাশ্বত সত্য বলে মেনে নিতে থাকেন। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে 'বিজ্ঞান' ও অঙ্কের বিভিন্ন আবিষ্কারক হিসেবে গ্রিকদের দেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসের একটু বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই সত্য আমাদের সামনে আসবে।

ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ক্রুসেড (১০৯৫-১২৯১ খ্রিঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। খ্রিস্টীয় উপাসনা পদ্ধতির হৃতগৌরব ফেরানোর জন্য ইউরোপে খ্রিস্টানদের লড়াইকে ক্রুসেড বলে। বিজ্ঞানে গ্রিকদের অবদানের সমস্ত কাহিনি ক্রুসেডের পরবর্তীকালের। এখন ক্রুসেডের তথা খ্রীস্টীয় উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে বিজ্ঞানে গ্রিকদের অবদানের যে অতিরঞ্জিত কাহিনি তার কি যোগ আছে সেই আলোচনাই করবো।

খ্রিস্ট্রীয় উপাসনার ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ক্রুসেডের আগে এবং ক্রুসেডের পরে। ক্রুসেডের আগে পর্যন্ত খ্রিস্টান দুনিয়ার 'অন্ধকার যুগ' এর সময়কাল (৫০০–১০৬৬ খ্রিঃ)। চতুর্থ শতাব্দীতে (৩১২ খ্রিঃ) রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের খ্রিস্টের উপাসনা-পদ্ধতি (Religion) গ্রহণের মাধ্যমে রাজশক্তি ও চার্চের মধ্যে বন্ধন স্থাপিত হলো। এরপরে রোমান-খ্রিষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে বই পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া (৩৯১ খ্রিঃ) এবং ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে জাস্টিনিয়ান এর স্কুল বন্ধ করে দেওয়া সহ বিভিন্ন ঘটনা খ্রিস্ট্রীয় দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। ক্রুসেডের আগেও যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্রিস্ট্রীয়-ইউরোপ খুব বেশি এগিয়ে ছিল তা বলা যাবে না। কারণ ইউরোপের ক্রুসেডের আগের সময়ের বিখ্যাত Mathematician পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার (Gerbert of Aurillac, Pope Sylvester II) এর Mathematics 'অ্যাবাকাস'-এ (বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে 'অ্যাবাকাস' এক খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়) সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু ক্রুসেড পূর্ববর্তী যে সময়ে খ্রিস্ট্রীয় ইউরোপের 'অন্ধকার যুগ' চলছে ঠিক সেই সময়ে ইসলামিক দুনিয়ার সুবর্ণ যুগ। নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ে বাগদাদে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া বইয়ের অনুবাদ হয় এবং খলিফা হরুন-আল-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রিঃ) এর উদ্যোগে এক লাইব্রেরি (Khizanat-al-Hakima) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন দশক পর এই লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পায় যে খলিফা আল-মামুন লাইব্রেরিকে আরো বড়ো করেন এবং নাম হয় ব্যাত-আল-হাকিমা (Bayt-al-Hakima) যা ইতিহাসে Baghdad House of Wisdom নামে সুপরিচিত। এই সময় বাগদাদে বইয়ের সংখ্যা এতো বেশি ছিল যে চিন থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি জেনে বাগদাদে কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন করতে হয়। সেই সময়ের ইসলামিক দুনিয়ায় লাইব্রেরির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দশম শতাব্দীতে উমাইয়া খিলাফতের সময়ে বর্তমান স্পেনের কর্ডোবায় এক সুবিশাল লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই ক্রুসেডের আগে ইউরোপ আরবীয়দের জ্ঞানচর্চার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করতো। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ইউরোপিয়ান ম্যাথামেটিসিয়ান, পোপ সিলভেস্টার সেই সময়ের গ্রিক-খ্রিস্ট্রীয় বাইজানটিয়াম এর পরিবর্তে ইসলামীয় কর্ডোবার থেকে Mathematical numerals আমদানি করেছিলেন আর তাই এখনো আমরা 'Arabic numerals' কথাটি শুনতে পাই। ম্যাথামেটিক্সের জন্য পোপের গ্রিসের পরিবর্তে আরবীয় দুনিয়ার দিকে মুখ ফেরানোতেই স্পষ্ট হয় যে, ক্রুসেডের আগে বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রিসের অবদানের গল্পের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

এখন প্রশ্ন, ক্রুসেড এবং তার পরবর্তী সময়ে গ্রিসে বিজ্ঞানের উদ্ভবের গল্পের সৃষ্টি হলো কেমন করে এবং কেন? ▯

সস্তায় চীনা পণ্য কেনা মানে আরও সস্তায় মেরুদণ্ড বিক্রি করা

অম্লান কুসুম ঘোষ

দুর্গাপূজার অবসানে আসে কালীপূজা ও দীপাবলি। এই আলোর উৎসবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সকলে আতশবাজি ও প্রদীপের দ্বারা গৃহকে আলোকিত করে তোলেন কিন্তু গত প্রায় এক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে একটি ভিন্ন পরিস্থিতি। মাটির প্রদীপ বা হস্তনির্মিত বাজির বদলে লোকে চীনা লেড আলো এবং চীনা বাজির দ্বারাই দীপাবলি পালনে তৎপর হচ্ছে।

অথচ আমরা জানি গত অর্ধশতাব্দী ধরে কমিউনিস্ট শাসিত চীন হচ্ছে ভারতের ঘোরতর শত্রু। ভারতের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৫০ সালে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ তিব্বত দখল করে নেয় এবং তারপর ১৯৬২ সালে ভারতের হাত থেকে ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ডকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। আগ্রাসী চীন কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট নয়, হিমালয়ের বাকি অংশ এবং অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত তারা ছলে-বলে-কৌশলে দখল করতে চায়। হিমালয়ের বুকে অবস্থিত ভারতবন্ধু নেপাল আজ পূর্বতন ভারত সরকারের উদাসীনতায় বর্তমানে কমিউনিস্ট চীনের করালগ্রাসে। হিমালয়ে অবস্থিত আরেক ভারতবন্ধু ভুটান চীনের কৌশলের কাছে নতিস্বীকার না করায় সেখানে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছিল তারা।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, অরুণাচল প্রদেশ সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত হিমালয়ের ঠিক প্রান্তদেশে অবস্থিত। তাই এই অঞ্চলটি হিমালয়ের বরফ গলা জলে সমৃদ্ধ থাকে সারাবছর, পাহাড়ি ঢাল বরাবর সেই জল প্রচণ্ডগতিতে নিম্নমুখী হয়, ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অরুণাচল প্রদেশসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত সোনার খনিসদৃশ। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মিলিয়ে পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ তেলের ভাণ্ডারের ওপর এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু খনিজ কয়লাজাত তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল গোটা বিশ্বের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র যখন বিকল্প শক্তির সন্ধানরত তখন এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ ভারতীয় অর্থনীতির এক চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু চীনের সেনাবাহিনীর আগ্রাসী নীতির কারণে সেই সম্ভবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

চীনা আগ্রাসন শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ, লাদাখ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে আবদ্ধ থাকবে তা নয়, তারা আক্রমণ করবে কাশ্মীর সীমান্তে আর এখানে তাদের দোসর হবে তাদেরই প্রদত্ত অস্ত্র ও অর্থে বলীয়ান পাকিস্তান। কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চিনের লালসাজর্জর দৃষ্টিনিক্ষেপ আজকের কথা নয়, স্বাধীনতার পর থেকেই মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কাশ্মীরকে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে এবং সেই কাজ তারা করছে চীনপ্রদত্ত অর্থবলে এবং অস্ত্রবলে।

কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান ও চীনের এত আকর্ষণ থাকার বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত, কাশ্মীরের প্রকৃতি যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তুলনারহিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী কাশ্মীর যেন আক্ষরিক অর্থেই ভূস্বর্গ। স্মরণাতীত কাল থেকেই পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এসেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের প্রতি পর্যটকদের এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে পর্যটনশিল্পে কাশ্মীরকে অনেক উন্নত করে তোলা যেত এবং প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকলেও পর্যটন শিল্পে কাশ্মীর গহন তিমিরে তলিয়ে গেল। এর একটাই কারণ কাশ্মীরে উগ্রপন্থার জন্য পর্যটকদের স্বাভাবিক ভীতি। এই ভীতি সৃষ্টি করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। তাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে পাকিস্তান আর পাকিস্তান বলিয়ান হচ্ছে চীনের সাহায্যে। তাদের লক্ষ্য একটাই উগ্রপন্থার ক্রমবর্ধমান চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত যদি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয় তাহলে পর্যটন শিল্পে কাশ্মীরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ও চীন নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক

উন্নতি করবে। চীন এবং চীনপ্রদত্ত অর্থ এবং অস্ত্রসাহায্যে বলীয়ান পাকিস্তান নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবে। পাকিস্তান না থাকলে শুধু কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের সাহায্যেই ভারত আজ বছরে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারতো যা ভারতের অর্থনীতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারতো এবং পর্যটন শিল্পে বহু লোকের কর্মসংস্থানও হতে পারতো।

চীন তার অর্থবলে এবং অস্ত্রবলে শুধুমাত্র নিজেদের, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এবং সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা যে শুধুমাত্র ভারতের সীমান্তেরই ক্ষতি করছে তা নয় সেই অর্থবল এবং অস্ত্রবল ভারতের অভ্যন্তরেও নিয়মিত প্রযুক্ত হচ্ছে ভারতের ক্ষতি সাধনের জন্য। মূলত কৃষিপ্রধান ভারত খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ, ভারতের প্রায় আশিটি এমন জেলা আছে যে জেলাগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। জেলাগুলি মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও বিহারের কিছু অংশে অবস্থিত। এই খনিজ পদার্থের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হলে ভারত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হত। কিন্তু ভারত শিল্পে স্বয়ম্ভর হলে চিনের বাজার নষ্ট হবে, চীন তার উৎপাদিত পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না, তাই চীন ভারতের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য এই জেলাগুলিতে মাওবাদী নামক উগ্রপন্থীদের অর্থ ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করেছে। চিনপ্রদত্ত অর্থবলে ও অস্ত্রবলে বলীয়ান মাওবাদীরা এই সমস্ত এলাকায় এমন অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে যে এখানে ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশের শাসনব্যবস্থা। ফলে ভারতের শিল্পে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

চৈনিক কৃতঘ্নতার আরেক নিদর্শন দেখা যাচ্ছে চিনা পণ্যের ক্ষেত্রে। ভারতের দয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদলাভ করে চীন যেমন ভারতের বিরুদ্ধেই ভেটো প্রয়োগ করেছিল সেরকমই ভারতে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা ভারতের সঙ্গেই শত্রুতা করছে। ভারতে ব্যবসা করে চীন যে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি লাভ করছে সেই অর্থের দ্বারা চীন নিজের এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে উন্নত করছে,

“আমরা যদি চীনাপণ্য বয়কট করে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি তবেই আমরা চীনের আগ্রাসনকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারবো।”

তাদের জন্য এবং সেই অত্যাধুনিক অস্ত্রের বলে বলীয়ান চীনা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতের সীমান্তে হামলা করছে এবং আমাদের দেশের বীর জওয়ানদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে আমাদের পকেট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা আমাদেরই সর্বনাশ করছে।

সাধারণ ভারতীয় ক্রেতা সস্তার মোহে পড়ে ভারতীয় পণ্যের বদলে চীনা পণ্য কিনে ফেলেন আর এর মাধ্যমেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভারত থেকে প্রতিবছর চীনে চলে যায়। গত অর্থবর্ষে চিনের সঙ্গে আমাদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০.৮ বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার ন'শো কুড়ি কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা হল চীন থেকে ভারতে হওয়া আমদানি এবং মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা হলো ভারত থেকে চীনে হওয়া রপ্তানি। অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি হল ৫২.৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। চীনের থেকে ভারতের আমদানীর মধ্যে পেট্রোলিয়াম নেই, তবু এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির কারণ চিনে নির্মিত সস্তা পণ্যের ভারতীয় বাজারে ব্যাপক বিক্রি হওয়া।

এছাড়াও চীনা পণ্য জাতীয় অর্থনীতির আর কী কী ক্ষতি করলো দেখা যাক।

প্রথমত, প্রত্যক্ষ চীনাপণ্যের বিক্রি বাড়ার সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসমূহের বিক্রি হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ভারতীয় পণ্য বাজার হারাচ্ছে। ফলে ভারতীয় শিল্প চাহিদার অভাবে ভুগছে। চাহিদা হ্রাসের ফলে শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ফলস্বরূপ কুটিরশিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বৃহৎশিল্পগুলি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথে হাটতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ কুটিরশিল্পের শিল্পী এবং বৃহৎশিল্পের শ্রমিক উভয়ই বেকারত্বের শিকার হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা দুইই হ্রাস পাচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনীতির অন্য দুই ক্ষেত্র কৃষি ও পরিষেবা চাহিদা হ্রাসের মুখে পড়ে, ফলস্বরূপ তাদেরও উৎপাদন হ্রাস করতে হয় ও কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ ধরতে হয়। ফলে পুনরায় চাহিদা হ্রাস ও অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই পুনরায় উৎপাদন হ্রাস ঘটে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি বেকারত্ব-ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস-চাহিদা হ্রাস-উৎপাদন হ্রাস-পুনরায় বেকারত্ব—এইরূপ পতনের এক চক্রে প্রবেশ করে।

এছাড়াও চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আরও কিছু ক্ষতির সম্মুখীন

হচ্ছে। প্রথমত, চীনাদ্রব্যগুলি ব্যবহার ও নিক্ষেপ (USE AND THROW) পদ্ধতির হওয়ায় পুরনো জিনিস সারাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কর্মচ্যুত হয়, মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে হওয়ায় এই কর্মচ্যুতির সাংখ্যিক হিসাব সম্ভব নয়, কিন্তু বড় সংখ্যক নিম্নবিত্ত ভারতবাসী যে এর ফলে বেকারত্বের জ্বালায় দগ্ধ হয় তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত, বংশপরম্পরায় চলে আসা বহু হস্তশিল্প যেগুলি শুধু ভারতের গৌরবই নয় বরং বহির্ভারতে ভারতের পরিচয়জ্ঞাপক (যেমন– বেনারসী শাড়ি, কাষ্ঠশিল্প, বাঁশের কাজ, টেরাকোটার কাজ প্রভৃতি) সেই হস্তশিল্পগুলির হুবহু নকল চিনাপণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেছে, ফলে সেই হস্তশিল্পগুলি বাজার হারাচ্ছে এবং হতাশ হয়ে শিল্পীরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, ফলস্বরূপ ভারতের গৌরব হিসেবে পরিচিত সেই হস্তশিল্পগুলি চিরতরে লোপ পেতে চলেছে। এককালে ব্রিটিশ অত্যাচারে যেমন ঢাকাই মসলিন বন্ধ হয়ে গেছিল, হয়তো একালে চৈনিক অত্যাচারে আরও অনেক হস্তশিল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

চীনা পণ্যের জোয়ারে ভারতের বাজারকে ভাসিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে চীন ভারতীয় অর্থনীতির কী কী ক্ষতি করছে তা তো বোঝা গেল, কিন্তু ক্ষতির এখানেই শেষ নয়, দেশের অর্থনীতির ভয়ংকরতম অবস্থা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। চীনা পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে সস্তা হয় কারণ চীনা পণ্যগুলি উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ভারতের বাজারে পাঠানো হয় অর্থাৎ চীনা পণ্যগুলি ভারতে পাঠানো হয় সাময়িকভাবে ক্ষতিস্বীকার করে। সাময়িকভাবে এই ক্ষতিস্বীকারের পেছনে থাকে এক দীর্ঘমেয়াদি দুরভিসন্ধি, চীনের সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ভারতীয় কারখানাসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুটীর শিল্পের শিল্পীরাও অভ্যাসের অভাবে ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা হারাবে। ভারতবর্ষ তখন বন্ধ শিল্পের এক শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। ভারতীয় ক্রেতারা তখন সম্পূর্ণরূপে চীনের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেই সময়ে ভারতীয় বাজারের ওপর সেই একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নেবে চীন। তখন তারা যে দাম দেবে ভারতীয় ক্রেতাদের সেই দামেই কিনতে হবে চীনের সামগ্রী। অর্থনীতির পরিভাষায় এই অপকৌশলকে বলা হয় ডাম্পিং। এই ডাম্পিঙের চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ যদি অবিলম্বে রোধ করা না যায় তাহলে দেশের যে দুরবস্থা হবে, অনাগত সেই ভয়ংকর ভবিষ্যৎ যেন কল্পনাকেও হার মানায়।

গোটা দেশের কী ক্ষতি হবে তা তো দেখা গেল। দেশের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গও এই ক্ষতির শিকার হবে। কিন্তু বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে বেশি। বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎশিল্পগুলি আগেই বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের উপার্জনের সবেধন নীলমণি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি, চীনা সস্তা পণ্যের আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে মূলত ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের উৎপাদনকারী এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই, পশ্চিমবঙ্গের যুবককুলের সামনে তাই বেকারত্বের হাতছানি বড় প্রকট। এছাড়াও চীনের সস্তা লেড আলো বিপদে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের মৃত শিল্পীকুলকে, চীনের সফট টয় বিপদে ফেলেছে এখানকার খেলনা নির্মাণকারী কুটিরশিল্পীদের। পশ্চিমবঙ্গের কুটিরশিল্পীরাও তাই আজ বড় বিপদাপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে টিম টিম করে টিকে থাকা একমাত্র শিল্প পাটশিল্পও আজ বিপদের মুখে। চীনের তৈরি বিভিন্ন সস্তা বিকল্প, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের নাভিশ্বাস তুলছে। দেশের মধ্যে সর্বাধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে চীনের অর্থনৈতিক আগ্রাসনে গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ আর তাই পশ্চিমবঙ্গের লোকেদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।

চীনাদ্রব্য ব্যবহারের ফলে অর্থনীতির চরম ক্ষতিতো হয়ই কিন্তু এই ক্ষতি শুধুমাত্র অর্থনীতির সীমানায় আবদ্ধ নেই। পরিবেশও চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ এসব চীনা পণ্য সাধারণত ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত হয় যা দামে সস্তা হলেও পরিবেশের ও ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র ব্যবহারকালে নয়, বরং ব্যবহারের পরে ফেলে দেবার পরও এই বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পরিবেশে মিশে যায় না, বরং দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে পড়ে থেকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ফলে দেশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয় এবং এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকের ও সরকারের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

ক্ষতিকর রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত পরিবেশশত্রু চীনাপণ্যগুলি মানুষের শরীরের পক্ষেও একই রকম ক্ষতিকর। চীনাপণ্য ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গ কঠিন অসুখের শিকার হচ্ছেন বিশেষ করে শিশুদের ওপর এর প্রভাব পড়ছে অসীম। শুধুমাত্র চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থনৈতিক ক্ষতির মাপকাঠিতে এই ক্ষতি পরিমাপযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী চীনা পণ্য চিরস্থায়ী ক্ষতি করছে দেশের মানবসম্পদে।

কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, চীনা জিনিস ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন? বর্তমানে বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনও দেশই কিন্তু একটি বিশেষ দেশের সব পণ্য বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ করতে পারে না।

তাহলে সমাধান কোথায়? সমাধান আছে। আমাদের বীর সেনানীরা সীমান্তে সংগ্রাম করবেন, কিন্তু অসামরিক জনসাধারণেরও দায়িত্ব আছে। ভারতবিরোধী সব কাজই চীন করছে এবং করবে আমাদের দেশে বিক্রীত চিনা পণ্যের মূল্যবাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকেই। তাই জনসাধারণ যদি চিনের পণ্য না কেনেন অর্থাৎ চিনের পণ্য বয়কট করেন তাহলে চীন অর্থাভাবে ভারতবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। ভারত সরকার চিনের সামগ্রী বিক্রি নিষিদ্ধ না করতে পারলেও কোনও বস্তু কেনা বা না কেনা তো সম্পূর্ণ ক্রেতার হাতে। চীনা পণ্যে ভারতীয় বাজার ছেয়ে গেলেও চীনা পণ্য কিনবো কী কিনবো না সেই সিদ্ধান্ত তো সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার নিজের। ক্রেতারা যদি চীনাপণ্য না কেনেন, তাহলে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত আইনসমূহও চীনের পণ্যকে ভারতের বাজার দখল করার সুযোগ দিতে পারবে না।

আমরা যদি চীনাপণ্য বয়কট করে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি তবেই আমরা চীনের আগ্রাসনকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারবো। ◻

প্রচ্ছদে ধর্মনিরপেক্ষতা ভেতরে ইসলাম

এবার দুর্গাপূজায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ আবারো প্রমাণ করেছে যে ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়নের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এ চলে গেছে। একদিকে ধর্মান্ধ মৌলবাদ, অন্যদিকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে ব্লাসফেমি হিসেবে ব্যবহার করে প্রশাসন বাংলাদেশে হিন্দুদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। পুলিশ লোক দেখানো অনেক গ্রেপ্তার করেছে, প্রতিটি ঘটনার পরই পুলিশ তাই করে কিন্তু ওই পর্যন্তই— আজ পর্যন্ত একজনেরও বিচার হয়নি। সরকার বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে সবকিছু এড়িয়ে যায়। এবার কুমিল্লার ঘটনা ছড়ায় ৪টি মহানগর এবং ২৮টি জলায়। আবারো প্রমাণিত, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত। অথচ সরকার ঢিলেঢালা মুডে আছে।

বলা হচ্ছে, ইকবাল নাকি ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী। মন্ত্রীদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, বাংলাদেশ ভবঘুরে, প্রতিবন্ধীদের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে? দেশে এখন প্রচ্ছদে ধর্মনিরপেক্ষতা, ভেতরে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ঢাকায় সিআইডি এখন বলছেন, ইকবাল পেশাদার অপরাধীদের মতো 'প্রশিক্ষিত'? পুলিশ প্রথমে ইকবালকে আটক করেও ছেড়ে দিয়েছিল। সবই নাটক? কোরান অবমাননার প্রথম অভিযোগ ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে, এরপর বলা হলো দুর্বৃত্ত, ইকবাল ধরা পড়লে বোঝা গেল তিনি মুসলমান, এখন ভবঘুরে পাগল। ধর্ম অবমাননা করেছে ইকবাল, তাঁর বাড়িতে একটা ঢিলও পড়েনি। বাড়ি পুড়েছে হিন্দুর, সম্পত্তি লুটপাট, ধর্ষণ, মন্দির-মূর্তি ভেঙেছে? এতে বোঝা যায়, বিষয়টি ধর্ম অবমাননার নয়, বরং 'গণিমতের মাল' দখল নেওয়া, হিন্দু খেদানোর?

কোরানের ভেতর ইয়াবা পাচার করলে, বায়তুল মোকাররমে প্রকাশ্যে কোরান পোড়ালে ধর্ম অবমাননা হয় না, তখন ধর্মপ্রেমীরা কোথায় থাকেন? দুর্গা মণ্ডপে কোরান রেখে যে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হলো এর বিচার কে করবে? হিন্দুরা পায়ে সাদা কাগজ লাগলেও প্রণাম করে, কখনো কোনো ধর্মগ্রন্থকে অপমান করে না— ওটা ইকবালরাই পারে— যাঁরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে নিজ ধর্মকে অপমান করে। কোরানে ইয়াবা হিন্দুরা রাখেনি, দুর্গা মণ্ডপে কোরান হিন্দু রাখেনি, কাবার ওপরে শিবের মূর্তিও হিন্দু রাখেনি, কিন্তু সবকটি ঘটনায় খেসারত দিয়েছে হিন্দু বা বৌদ্ধ। তবু আইনমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের প্রয়োজন নেই, সংবিধানে তাঁদের সুরক্ষার বিধান আছে?

দেশে হিন্দুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে রাজনৈতিক দল, প্রশাসনের ভেতরে ধর্মান্ধ-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদত আগের মতো এবারো ছিল। আমরা স্লোগান দিই, ধর্ম যার যার উৎসব সবার', এখন হয়তো বলা যায়, 'ব্যথা যার যার লজ্জা রাষ্ট্রের'। কুমিল্লার ঘটনার পর এটা স্পষ্ট যে, হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে সর্বদলীয়ভাবে। এ সত্য লুকিয়ে লাভ কী বা লুকানো কি যাবে? অথচ আওয়ামি লিগ বলেছে, বিএনপি করেছে। বিএনপি বলছে, আওয়ামি লিগ করেছে। রিজভি বলেছেন, মন্দির ভাঙনের পরিকল্পনা হয়েছে গণভবনে। তথ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুর্গাপূজার আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছে লন্ডনে। কী চমৎকার নাটক! এ নাটক বন্ধ হোক।

রাষ্ট্রীয় বৈষম্য এখন স্পষ্ট এবং সর্বত্র, এটি প্রতিদিন বাড়ছে। ১৫ বছরের পরিতোষকে আদালত ১০ দিনের রিমান্ড দেন, আর ইকবালকে সাত দিনের? ইকবাল বজরংবলীর কোলে কোরান রেখেছিল, আর পরিতোষ ফেইসবুকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ছবি দিয়েছিল, কার অপরাধ বেশি? একটি ভুল ভিডিয়ো শেয়ার করার জন্যে শিক্ষিকা রুমা সরকারকে পুলিশ যেভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাতে একটা 'বিজাতীয় বিদ্বেষ' ছিল, তাঁর অপরাধ কি ইকবালের চেয়েও বেশি? কুমিল্লার ওসি হাতে কোরান রেখে যখন ফেইসবুকে লাইভ করতে দেন তখন সমস্যা হয় না, অন্যায় শুধু রুমা সরকার বা পরিতোষের পোস্টে? ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে সরকার এবার রুমা, পরিতোষ ছাড়াও শোভন দাস, (২৭), প্রান্ত সমাদ্দার, (১৫), হৃদয় সরকার, ২০; মহেন্দ্র বৈদ্য; জয় মণ্ডল, নরেশ কুমার দাস; রিপন দাস; বিষ্ণু ঢালী, অসিত বরণ দাস ও আশিস মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে, হয়তো আরও আছে, আমরা জানি না।

দেশে হিন্দুরা বলছেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে বাংলাদেশ ব্যর্থ। আসলে কি তাই? বাংলাদেশ কী চাইলে নিরাপত্তা দিতে পারে না? পারে, প্রশ্নটা হলো সদিচ্ছার, সরকার চাচ্ছে কিনা? পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেছেন, কোনো মন্দির পোড়েনি, কেউ ধর্ষিতা হয়নি। আইনমন্ত্রী বলেছেন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের দরকার নেই। এসব বক্তব্যে সরকারি অবস্থান স্পষ্ট হয়, অথচ সরকার এত কিছুর পরও 'বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান' অবস্থানে অনড়। হিন্দুর মাথায় আঘাত করাই যখন সম্প্রীতি, তখন হিন্দুদের 'নিজেদের রাস্তা নিজেদেরই দেখে নিতে হবে? বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে হিন্দুদের শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'।

—শিতাংশু গুহ,
নিউ ইয়র্ক।

গান্ধী-কথা

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবর্ষে পাক্ষিক পত্রিকা দেশ-এ বিভিন্ন লেখক গান্ধীজীর জীবন, দর্শন ও তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'গাঁধীর উত্তরাধিকার' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনিতে, (দেশ, ২.১০.১৮, পৃ.

২৫) সুপ্রতিম দাশ লিখেছেন, গাঁধীর গণ-আন্দোলনের প্রথম পাঠ দক্ষিণ আফ্রিকায়, সে কথাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু তারপরে সুপ্রতিমবাবু যে লিখেছেন, ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ী আব্দুল্লার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৯৩ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে পৌঁছন, তা থেকে মনে হবে, গণ-আন্দোলন করার জন্য আব্দুল্লা গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেকেছিলেন। আব্দুল্লা গান্ধীকে চেয়েছিলেন নিছক ব্যবসায়িক কারণে। লক্ষ্মীদাসের পরিচিত পোরবন্দরের ব্যবসায়ী সংস্থা দাদা আব্দুল্লা অ্যান্ড কোম্পানি লক্ষ্মীদাসের কাছে জানতে চেয়েছিল মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে রাজি আছেন কিনা। কোম্পানি দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতে একটি বড়ো মামলা লড়ছে। কোম্পানি ওই মামলায় বড়ো বড়ো ব্যারিস্টার নিয়োগ করেছে। লক্ষ্মীদাস যদি তাঁর ভাইকে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেখানে তাঁর কাজ হবে কোম্পানির হয়ে সাহেব ব্যারিস্টারদের কেসটা বুঝিয়ে দেওয়া।

তাছাড়া, কোম্পানির বেশির ভাগ চিঠিপত্র ইংরেজিতে লিখতে হয়, সেই চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে তিনি কোম্পানিকে সাহায্য করবেন। মোটামুটি বছর খানেকের কাজ। ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াতের ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ ছাড়া কোম্পানি একশো পাঁচ পাউন্ড দেবে। ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেছিলেন। সেই যাত্রা গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য নয়; সেটা ছিল, একটা ব্যবসায়ী কোম্পানির নিছক একটি এক বছরের মেয়াদি চাকুরে হিসেবে। উল্লেখ্য, গান্ধীজীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মামলার বাদী-বিবাদী দুই পক্ষ আপোশ-মীমাংসায় সম্মত হয় এবং তাঁর সুপরামর্শে একজন মধ্যস্থ নিয়োগ করে। ফলে, মামলাটির সুষ্ঠু মীমাংসা হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার পর্ব শেষ। এবার গান্ধীজী স্বদেশে ফিরবেন। তাঁর সম্মানে দাদা আব্দুল্লা জমকালো বিদায়সভার আয়োজন করেছিলেন। সারাদিনের প্রোগ্রাম। 'হারিয়ে যাননি আজও' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনিতে, (দেশ, ২.১০.১৯, পৃ. ২১), সুমিত মিত্র লিখেছেন—সেখানে সহসা এক ব্যক্তি এসে গাঁধীর হাতে স্থানীয় দৈনিক 'নাটাল মার্কারি'-র একটি কপি ধরিয়ে দিয়ে গেল। উপরের পৃষ্ঠায় বড়ো হরফে শিরোনাম 'Indian Franchise' ...সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ভোটাধিকার রদের জন্য একটি সরকারি বিল জমা পড়েছে নাটাল সংসদে। শ্রী মিত্র আরও লিখেছেন—...গাঁধী খবরটি দেখেই ঠিক করে ফেলেন, তিনি থেকে যাবেন। লড়বেন এই অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে...। শ্রীমিত্র-র বক্তব্যে ভেজাল আছে।

(১) সেখানে সহসা এক ব্যক্তি এসে গান্ধীর হাতে 'নাটাল মার্কারি'-র একটি কপি ধরিয়ে দিয়ে যাননি। সেখানে কয়েকটা খবর কাগজ পড়েছিল; তার একটির পাতা ওল্টাতে গিয়ে এক কোনায় একটি ছোটো প্যারাগ্রাফ ('উপরের পৃষ্ঠায় বড়ো হরফে' নয়), শিরোনাম 'Indian Franchise' গান্ধীজীর নজরে পড়েছিল। বিলটি পাস হয়ে গেলে ভারতীয়দের মান-মর্যাদা নিরাপত্তা যে কিছুই থাকবে না, গান্ধী সেসব কথা বললে দাদা আব্দুল্লা বলেছিলেন, তাঁরা ওসব আইন-কানুনের কিছুই জানেন না, বোঝেনও না। তাঁরা শুধু তাঁদের ব্যবসাটাই বোঝেন। তাও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে তাঁদের ব্যবসা বন্ধ করে দিলে তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন; কিন্তু কোনো ফল হয়নি। নিরক্ষরতাই তাঁদের খোঁড়া করে রেখেছে। তাঁরা খবর কাগজ কেনেন কেবল বাজারদর জানার জন্য। গান্ধীজী যা বলতে চাইছেন, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন। তিনিই বলুন এখন তাঁদের কী করতে হবে? আমন্ত্রিতেরা যাঁরা ওই আলোচনা শুনছিলেন তাঁরা আব্দুল্লার কথায় সায় দিয়ে বলেছিলেন, গান্ধীভাই দেশে ফেরা স্থগিত রেখে আরও মাসখানেক এখানে থাকুন আর বলে দিন কীভাবে তাঁদের লড়তে হবে। গান্ধীজীও আরও মাসখানেক থেকে গিয়েছিলেন।

(২) সুমিতবাবু যে গান্ধীজীর 'থেকে যাবার' সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন তা আরও মাসকয়েক পরের ঘটনা; এবং সেই সিদ্ধান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। ১৮৯৪ সালের ২২ আগস্ট ডারবানে 'নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস' নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করে দিয়ে গান্ধীজী উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা ছেঁকে ধরেন, তিনি যেন স্থায়ীভাবে নাটালেই থেকে যান। গান্ধীজী তাঁর নানা অসুবিধার কথা তাঁদের বলেন। নিজের জীবিকার জন্য তিনি দশজনের কাছে হাত পাততে পারবেন না। তাঁকে ওখানে থাকতে হলে একজন ব্যারিস্টার হিসেবেই থাকতে হবে। আর, ব্যারিস্টার হয়ে যদি ব্যারিস্টারি চালে না থাকেন তাহলে নাটালে ভারতীয়দের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বছরে তিন হাজার পাউন্ডের কমে ওই রকম ঠাট বজায় রাখা সম্ভবপর হবে না। নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় যদি ওই পরিমাণ টাকার ওকালতির কাজ তাঁকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলেই তিনি থেকে যেতে পারবেন। তখন কুড়িজন আরব ব্যবসায়ী গান্ধীজীকে ব্যারিস্টার হিসেবে আগাম নিয়োগ করে বছরে তিন হাজার পাউন্ড প্রতিশ্রুতি দেন; গান্ধীজীও নাটাল-এ থেকে যান। থাকার জন্য অভিজাত পল্লীতে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। দাদা আব্দুল্লা বিদায় দক্ষিণা হিসেবে তাঁকে যে টাকা দেবেন ভেবেছিলেন, তাই দিয়ে তাঁর বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্র : 'আত্মকথা'— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)

গান্ধীজীর মহিমাকীর্তন করে পত্র-পত্রিকায় ইদানীং যে সকল লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য-বিকৃতি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সাড়া মিলছে না। ফলে, ওইসব বিকৃত ইতিহাসই প্রামাণ্য হিসেবে থেকে যাচ্ছে। সে কারণে এত কথা লিখতে হচ্ছে।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
পর্ণশ্রী, কলকাতা।

মা-ই সনাতনী শিক্ষার বীজবপনের প্রথম গুরু

অগ্নিশিখা নাথ

মাথায় ঘোমটা টেনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শঙ্খ হাতে দাঁড়িয়ে কোনো হিন্দু রমণীর ছবি এখন শহরাঞ্চলে তো খুব একটা দেখা যায় না। এমনকী গ্রামাঞ্চলেও ধীরে ধীরে শঙ্খের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছে। কিন্তু এই চিত্র কি অভিপ্রেত? এ কোন আধুনিকতার ছোঁয়া স্পর্শ করছে আজকের নারী সমাজকে। আমাদের ছোটোবেলায় যখন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসতাম, মনে আছে মা সন্ধ্যা দিতেন। পরনের শাড়িটি পালটে শুদ্ধ বস্ত্রে হাতে গঙ্গাজল নিয়ে বাড়ির সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে গঙ্গাজলের ছিটা দিচ্ছেন মা। আমার মাথায় এসেও দু'এক ফোঁটা পড়ত। এরপর ধুনুচি হাতে, সারা বাড়িময় ধুনোর গন্ধ, মায়ের সেই রূপ যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকুর। খুব ভালো লাগতো যখন শঙ্খধ্বনি আমাদের বাড়ির দেওয়াল ভেদ করে পৌঁছে যেত গোটা পাড়ায়। আর প্রতিধ্বনি হয়ে এক এক করে পাড়ার সব বাড়ি থেকে ভেসে আসত সেই আওয়াজ। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। শান্তস্নিগ্ধ সন্ধ্যা, তার প্রতিটি পরতে পরতে সনাতনী চেতনার আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। প্রকৃত অর্থে একজন মা-ই পারেন তার সন্তানের মধ্যে সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে। মায়ের কথা কেন উঠে আসছে বার বার তা পরে বলছি। তবে যে সন্ধ্যের বর্ণনা দিলাম তা পাঠকদের অনেকেরই নিশ্চয়ই খুব পরিচিত এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ সন্ধ্যের ওই শঙ্খধ্বনির আওয়াজের বড়ো বেশি প্রয়োজন। যখন মসজিদের আজানের আড়ালে তাকে দাবিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনামাফিক কুচক্রান্ত চলছে, সুনিপুণ কৌশলে জেহাদিরা এবং সেকু-মাকুদের দল ধীরে ধীরে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা সংস্কৃতিতে থাবা বসাচ্ছে— আমরা সচেতন বা সজাগ হচ্ছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বছরের কিছু নির্দিষ্ট দিনে পুজোয় অঞ্জলি দিয়ে নিজেদের সনাতনী আচার পালন করলে কি কর্তব্য শেষ হবে? আমরা যদি মনে করি, বছরের নির্দিষ্ট দিনে ভাষা আন্দোলন পালনের মধ্য দিয়ে আমরা এই আগ্রাসনকে আটকাতে পারব তাহলে সেই দিবাস্বপ্ন দেখাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ হয় ততই ভালো। কত মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ওরা, কত সংস্কৃতির অবসান হলো, কত নিষ্পাপ অসহায় সনাতনীর প্রাণ গেল বিসর্জন। তবুও কি আজও আমরা একইভাবে উদাসীন থাকব।

দুর্গাপুজোর চারটে দিন মাইকে মন্ত্রোচ্চারণের অভ্যেসটা যদি বছরের প্রত্যেকটা দিনেই রূপান্তরিত হয় তবেই সম্ভব পরিবর্তন। লক্ষ্মীপুজোয় ঘটা করে পুজো করার থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়িতে লক্ষ্মীর ঘট প্রতিস্থাপিত হবে, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি পাঁচালির গানে গানে ভরে উঠবে মাতৃভূমির অলিগলি। পবিত্র গ্রন্থ শ্রীমৎভাগবৎ গীতা পাঠ হবে প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে। প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে যেতে হবে মন্দিরে। বড়োদের হাত ধরেই তো ছোটোরা শিখবে।

হিন্দুদের ইতিহাস রামায়ণ ও মহাভাবত জানাতে হবে শিশুদের। প্রতিটি চরিত্রকে বর্ণনার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে তাদের কাছে। বিষ্ণুর দশ অবতার যে কতটা বৈজ্ঞানিক তাও তো তাদের জানাতে হবে। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মিলিত চেতনাই যে সনাতন চেতনা— এই ব্যাখ্যা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে আমাদেরই। প্রতিদিনের জীবনচর্চায় ফিরিয়ে আনতে হবে সুস্থ ধর্মীয় সংস্কার।

এই সকল শিক্ষায় মায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। মা আমাদের প্রথম গুরু। মা-ই পারেন আগামী প্রজন্মকে সঠিক ধর্মীয় চেতনায় দীক্ষিত করতে। একইসঙ্গে তুলসীমঞ্চে জল দেওয়ারও যে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে, তুলসী গাছ যে সর্বাধিক অক্সিজেন প্রদান করে— এই শিক্ষাও মাকেই দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে। শহুরে আদবকায়দায় বড়ো হওয়া আজকের কচিকাঁচারা ভোরের সূর্য দেখে না, ব্রাহ্মমূহূর্ত অর্থাৎ সূর্যের আলো ফোটার আগে যে মন শান্ত থাকে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে পড়াশোনার জন্য তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয় তাও বোঝাতে হবে মাকেই। অতীতে মুনি-ঋষিরা কেন ওই সময় ধ্যানমগ্ন হতেন তার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতে হবে মা-কেই।

কালীপূজায় চৌদ্দশাক চৌদ্দ বাতির ব্যাখ্যা বা কার্তিক মাসে সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার ব্যাখ্যা শিশুকে দেওয়া সবই একজন মায়ের কর্তব্য। কারণ একটি শিশু যখন বড়ো হয়, সমাজ পরিবেশ পরিবার সম্বন্ধে একটু একটু করে জানতে পারে, তখন সবচেয়ে বেশি সময় মায়ের সঙ্গেই থাকে। মাকেই সে তার জীবনের প্রথম গুরু হিসেবে পায়। তাই বলাই যায়, আগামী প্রজন্মকে সনাতনী চিন্তা চেতনায় সম্পৃক্ত করতে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। □

কয়েক টুকরো শশা খেলে কমবে পেট ফাঁপা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

খাবার খাওয়ার পরে অনেকেরই পেটফাঁপা, পেটে অস্বস্তির মতো সমস্যাগুলি হয়। দু'একদিন হলে এগুলি নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু যদি এগুলি দিনের পর দিন হতে থাকে তাহলে বিষয়টা অস্বস্তিকর বই কী। তাহলে আপনি কী কী খাবার খাচ্ছেন, কোনও খাবার থেকে আপনার ক্ষতি হচ্ছে কি না সেই বিষয়টায় আলোকপাত করতে হবে। কিছু খাবার আছে যেগুলি পেটফাঁপা, গ্যাস অম্বলের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়, আবার কিছু খাবারে এইসকল সমস্যাগুলি কমে। আসুন একবার সেই তালিকাটি দেখে নেওয়া যাক।

কোন কোন সবজি মেনু থেকে বাদ :

১. **ব্রকোলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি**— এই তিনটি সবজিই ক্রুসিফেরাস গোত্রের। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন ও মিনারেল ঠাসা হলেও এর মধ্যে থাকে র‍্যাফিনোস নামক একটি শর্করাজাতীয় উপাদান। যতক্ষণ না আপনার পেটে ব্যাকটেরিয়া এটির ফারমেন্টেশন ঘটায় ততক্ষণ এর হজম শরীর করতে পারে না। এর থেকেই পেটে গ্যাস, পেটফাঁপার সমস্যা। পেটফাঁপা বা ব্লুটিং খুব বাড়লে এই ক্রুসিফেরাস সবজিগুলি বাদ দিন।

২. **ডাল জাতীয় দানাশস্য ও সোয়াবিন**— ডালজাতীয় দানাশস্য, সোয়াবিনস, বিনস, কড়াইশুটি, রাজমা ইত্যাদি থেকেও গ্যাস ও পেটফাঁপার সমস্যা হয় বলে আমরা জানি। কিন্তু যখন মেনুতে এগুলি থাকে বিষয়টা খেয়াল করি না। এগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন থাকে, যেটা শরীরের জন্য উপকারী, কিন্তু সঙ্গে প্রচুর শর্করা ও অদ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা সহজে আমাদের শরীরে হজম হয় না, বিশেষ করে গ্যাস্ট্রোইনস্টেস্টিনাল ট্রাক্টে কোনও সমস্যা হলে। ডাল জাতীয় খাবার বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করার পরে পরেই অনেকের এখান হয়ে পেট ফুলে যায়।

৩. **দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য**— ডেয়ারি প্রোডাক্ট থেকেও গ্যাস ও পেটফাঁপার সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে যাদের ল্যাকটোজেন ইনটলারেন্স বা মিল্ক প্রোটিন ইনটলারেন্স আছে। আচ্ছা, আপনি কি কখনও খেয়াল করে দেখেছেন কয়েক স্লাইস চিজ কিংবা গরম দুধ দিয়ে একবাটি সিরিয়াল প্রাতঃরাশে খাওয়ার পরেই পেটব্যথা, পেটে কামড় দেওয়ার মতো সমস্যা হচ্ছে কী না। তাহলে বুঝতে হবে শরীরে লাকটোজ ইনটলারেন্স আছে। মানে দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবারে থাকা শর্করা ল্যাক্টোজকে ভাঙার জন্য যে উৎসেচক দরকার সেটি শরীরে নেই, তাই গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্রাক্টে সমস্যা হচ্ছে, সেখান থেকেই পেটফাঁপার সমস্যা হতে পারে। কাজেই ল্যাকটোজ ফ্রি দুধ ও ডেয়ারি প্রোডাক্ট বাছার চেষ্টা করুন।

৪. **আপেল**— আপেল খেলে অনেক রোগ ব্যাধি কমে বলে আমরা জানি। কিন্তু পেটফাঁপার সমস্যাও হয় কারও কারও অনেকেরই অজানা। এতে উচ্চমাত্রায় ফাইবার থাকার পাশাপাশি এর মধ্যে আছে ফ্রুক্টোজ, সরবিটোল এবং এমন কয়েক ধরনের শর্করা যা বেশিরভাগ মানুষই হজম করতে পারে না। তারপরে গ্যাস হয়ে পেট গুড়গুড় করা, পেট ফুলে যাওয়া, পেটের মধ্যে মনে হয় জল হয়েছে। ব্লুটিং যত বাড়তে থাকে, শরীরের অস্বস্তিও ততই বাড়ে। তবে আপেলের প্রচুর উপকারিতা আছে, যেমন— হার্টের সমস্যা কমায়, শ্বাসকষ্ট কমায়, অ্যাজমা, ব্রংকাইটিস, এম্ফোসিমার নিরাময়ে ভূমিকা রাখে। তাই ব্লুটিং যদি না থাকে, তাহলে মাঝে মাঝে দু'একটা আপেল খেতে পারেন, তবে মোটেই নিয়মিত নয়।

কী খাবেন : অনেকেই চোখের তলায় ফোলাভাব কমাতে রূপচর্চায় শশার ব্যবহার করেন। তবে পেটের ক্ষেত্রেও একইভাবে তা প্রযোজ্য। পেট ফাঁপা, পেট ফুলে যাওয়া কমাতে শশা সমানভাবে কার্যকর। এই ফলটির মধ্যে থাকা ক্যুয়েরসিটিন নামক একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যে কোনও রকমের প্রদাহ কমায়। জি আই ট্র্যাক্টের প্রদাহ কমাতেও শশা সমান কার্যকর। শশার মধ্যে প্রদাহবিরোধী উৎসেচক পর্যাপ্ত মাত্রায় যে আছে তা বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত, এটি পেটফাঁপা আটকানোর সহায়ক। জলে কয়েকটুকরো শশা খেলেও হজমের সমস্যা মেটে। কলাতে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য চলতে চলতেও আবার পেটফাঁপা শুরু হয়ে যায়। পেট পরিষ্কার না হলো বর্জ্যগুলি পেটে জমতে জমতে জিআই ট্র্যাক্টে ধাক্কা দেয়, সেখান থেকেও পেটফাঁপার সমস্যা হয়। পেঁপের মধ্যে প্যালাইন নামক একটি প্রোটিন থাকে যা খাদ্যনালীতে প্রোটিন ভাঙতে সাহায্য করে। এর ফলে হজম প্রক্রিয়া সহজেই হয়ে যায়। এর মধ্যে ফাইবার আছে, উপরন্তু পেঁপের মধ্যে প্রদাহনাশক ক্ষমতাও বর্তমান। ফলে এগুলি সমস্ত মিলে খাদ্যনালীকে যেমন সুরক্ষা দেয়, তেমনি হজমে সাহায্য করে, পেটফাঁপার সমস্যাও কমায়। পাকা পেঁপে কেটে খেতে পারেন অথবা পেঁপে দই দিয়ে স্মুদি বানিয়েও খেতে পারেন। গরমের দিনে খেতে ভালোই লাগবে। ◘

করোনা অতিমারিতে বহুলাংশে বেড়েছে নারী ও শিশু পাচার

বিশ্বপ্রিয় দাস

করোনা অতিমারি আমাদের রাজ্যে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সূচনা করেছে। সেটা হলো অর্থনৈতিক ভাবে সমাজের একটি শ্রেণীর একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া। এই শ্রেণী হচ্ছে একেবারে গ্রামাঞ্চলে থাকা নিম্ন আয়ের মানুষজনেরা। যাদের ঘরে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করাটাই এখন নিত্যদিনের চ্যালেঞ্জ। বাড়ির একটু বড়ো হওয়া মেয়ে বা ছেলে, সংসারকে সামান্য হলেও রিলিফ দেবার জন্য হয় কাজের খোঁজে বেরোচ্ছে, নয়তো বা কারোর প্রলোভনে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

আমাদের রাজ্যে এখন শাসক দল নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে বা দোষ ঢাকতে গলাবাজি নয়তো বা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই ব্যস্ত। কিন্তু একেবারে নিম্ন আয়ের ঘরে দুবেলার জন্য দুমুঠো অন্ন কীভাবে জোগান দেওয়া যায়, সেই চিন্তা থেকে দশ হাত দূরে রয়েছে শাসক দল। হয়তো বলবেন বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই চাল বা গম কি কাঁচা খাবে? অন্য জিনিস কিনতে গেলে যে পয়সা লাগবে তা আসবে কোথা থেকে? সাধারণ মানুষের এই অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছেন কিছু সুযোগ সন্ধানী। আর তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের ঘরের মেয়েরা বিক্রি বা পাচার হয়ে যাচ্ছে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। আন্তর্জাতিক ভাবে সংগঠিত এই অপরাধ ক্রমেই মানবাধিকারের এক গভীর সংকট হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক কার্যালয়ের (ইউএনওডিসি) সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক রিপোর্ট গ্লোবাল রিপোর্ট অন ট্রাফিকিং ইন পারসন ২০২০-তে বলা হয়েছে যে এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক পাচারচক্র অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সুসংগঠিত ভাবে সমাজের প্রান্তিক ও অসহায় মহিলা ও শিশুদেরই চিহ্নিত করে। তাদের দারিদ্র্য ও

অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রোজগারের প্রলোভন দেখিয়ে এই পাচার প্রক্রিয়ার ফাঁদে ফেলে। বেশির ভাগ সময়ে ভুক্তভোগী এই মানুষগুলো নিজেদের অজান্তেই যৌন নির্যাতনের, বলপূর্বক শ্রম, গৃহকর্মের নামে আরও অন্যান্য ধরনের শোষণের শিকার হয়ে যায়। ইউএনওডিসি-র ওই রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতি ১০ জন পাচার হওয়া মানুষের মধ্যে ৫ জন মহিলা আর ২ জন নাবালিকা। বিভিন্ন গবেষকের করা গবেষণায় পাওয়া যাচ্ছে এই তথ্য। আর এতেই মাথা ঘুরে গেছে সমাজতত্ত্ববিদদের।

ইউনিসেফের মতে, এখন পাচার হওয়া মানুষের মধ্যে নাবালিকা বা শিশুর সংখ্যাটাই বেশি। একজন পাচার হয়ে যাওয়া শিশু বা নাবালিকা তাকেই বলা হবে যার বয়স ১৮ বছরের কম এবং যাকে পাচার করা হয়েছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, শারীরিক ভাবে শোষণ করার জন্য দেশের ভিতরে বা বাইরে গ্রহণ করা হয়েছে। আর সেই নাবালিকা বা শিশুটি হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। এই পাচার করার ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের রাজ্যে নাড়াচড়া খুব কম। তার কারণ, সামাজিক লজ্জার ভয়ে অনেক বাবা-মা অভিযোগ জানাতে পুলিশের দ্বারস্থ হন না। এই পাচার রোধে যারা কাজ করছেন সেইসব বেসরকারি সংস্থা জানাচ্ছে, একটি নাবালিকা পাচার হয়ে যাবার পর তার বাবা-মা অভিযোগ জানাতে দ্বারস্থ হলে, অভিযোগ নিতেই চায় না পুলিশ। নানা অজুহাত দেখিয়ে হটিয়ে দেয়। আবার উলটো দিকে সামাজিক ভাবে নিজেদের সম্মান ধরে রাখতে অভিভাবকরা লুকিয়ে যান বিষয়টি। ফলে পাচার করার ব্যাপারটির তদন্ত করা এবং অপরাধীকে খুঁজে বের করার বিষয়টি খুবই কষ্টসাধ্য। যে কারণে এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়াও খুব কঠিন। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর ১০ লক্ষ ২০ হাজার শিশু গোটা বিশ্ব জুড়ে পাচার হয়ে যায়। এটি চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের দেওয়া তথ্যই বলছে। আর দেখা গেছে পাচার হয়ে যাওয়া শিশুদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সারা ভারতের বিভিন্ন নিষিদ্ধপল্লীতে বেশ্যাবৃত্তির কাজে লাগানো হয়। একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক বিপ্লব মণ্ডলের কথায়, পাচারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয় না শুধুমাত্র প্রশাসনিক অসহযোগিতায়। আর কিছুটা তো যার পরিবারের সদস্য পাচার হয়ে যাচ্ছে, সেই পরিবারের পক্ষে থানায় গিয়ে অভিযোগ করার মতো সাহস থাকে না, নয়তো বা থানার নানা কথা শুনে ফিরে আসতে হয়। একই কথা নদীয়া বা ক্যানিং, মালদা বা উত্তরবঙ্গের এই পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকা মানুষজনের। পশ্চিমবঙ্গে পাচার হওয়া দুই তৃতীয়াংশ শিশুই হলো বালিকা। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশই হয় প্রাথমিক স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়েছে বা কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পায়নি। এতে বোঝা যায় পাচার হওয়ার সঙ্গে শিক্ষার একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দুই ২৪ পরগনা পাচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা পাচারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই জেলা থেকে কাজের সন্ধানে নারী ও শিশুকে পাচার করে কলকাতা ও অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য একটা মাইগ্রেশন কার্ড চালু করেও লাভ হয়নি। কেননা পঞ্চায়েত স্তরেই এটা নিয়ে সেভাবে উদ্যোগের অভাব দেখা গিয়েছে। মাইগ্রেশন থাকলে কাজের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছে আর কার সঙ্গে যাচ্ছে, সেটা লিপিবদ্ধ থাকত। আর খুঁজে পেতে সহজ হতো।

কলকাতাকে পাচার হয়ে আসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। রেড লাইট এলাকায় দেহব্যবসার দিক দিয়ে মুম্বই ও দিল্লির পাশাপাশি এই শহরের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এইসব শহরে চা-বাগান অঞ্চল থেকে পাচার হয়ে আসাটা খুবই প্রচলিত। ভুটান ও অসম থেকে নারী পাচার হয়ে আসার ক্ষেত্রে

একনজরে বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া একটা পরিসংখ্যান

● পশ্চিমবঙ্গে পাচার হওয়া দুই তৃতীয়াংশ শিশুই হলো বালিকা। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশই হয় প্রাথমিক স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়েছে বা কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পায়নি। এতে বোঝা যায় পাচার হওয়ার সঙ্গে শিক্ষার একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

● পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দুই ২৪ পরগনা পাচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা পাচারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই জেলা থেকে কাজের সন্ধানে নারী ও শিশুকে পাচার করে কলকাতা ও অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

● কলকাতাকে পাচার হয়ে আসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। বেশ্যালয়ে দেহব্যবসার দিক দিয়ে মুম্বই ও দিল্লির পাশাপাশি এই শহরের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই সব শহরে চা-বাগান অঞ্চল থেকে পাচার হয়ে আসাটা খুবই প্রচলিত।

● ভুটান এবং অসম থেকে নারী পাচার হয়ে আসার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি পাচারের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙে বাইরের রাজ্য থেকে এবং সন্নিহিত বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ শিশু আমদানি করা হয়।

● সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পাচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে এসেছে।

● পাচারের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এক ফসলি জমি, অন্যান্য জীবিকার অভাব ইত্যাদি। ২০০৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধুসূদনপুর গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে।

গ্রামের প্রতি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বাড়ির খরচ চলে পাচার হয়ে যাওয়া ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়েসি কিশোরীর রোজগার থেকে

এবার একটি গবেষণার কিছু অংশ দেখা যাক, ওই সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানব-পাচার ক্রমেই এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ২০১৮-র রিপোর্টে উল্লিখিত একটি পরিসংখ্যানের দিকে সবার নজর পড়তে বাধ্য। কেননা ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিশ্বে প্রতি বছরে এই লাভজনক ব্যবসা থেকে আয় হয় প্রায় ১৫০ বিলিয়ান মার্কিন ডলার। এই পরিসংখ্যান থেকে সবাই সহজেই এই মানব-পাচার প্রক্রিয়ার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া জাল ও তার ব্যাপ্তির একটা আভাস জানতে পারছে। বস্তুত, কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে যে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেমন কর্মহীনতা, বে-রোজগারি, আর তার জন্যেই রমরমা বেড়েছে পাচার ব্যবসার। ওই গবেষণায় আরও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, বর্তমানে ইউএনওডিসি-র রিপোর্টের বিশ্লেষণ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। ওই সংস্থার ২০২০ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের পাচার হওয়ার হার প্রায় সমান, যথাক্রমে ৪৫ (ছেলে ২৪ এবং মেয়ে ২১ শতাংশ) এবং ৪৪ শতাংশ। যাঁরা এই মানব-পাচারের শিকার হন, তাঁদের অধিকাংশই বলপূর্বক শ্রমের (ফোর্সড্ লেবর) জন্য পাচার হন যা মোট সংখ্যার ৫২ শতাংশ এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হন সেই অনুপাতে কিছুটা কম, ৩৬ শতাংশ। তবে বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায় অনেক মহিলা যাঁরা প্রথম পর্যায়ে শ্রমিক হিসেবে অর্থের সংস্থানে নিজেদের বাড়ি, ঘর ছেড়ে পথে নামেন তাদের অবশেষে ঠাঁই হয় কোনও নিষিদ্ধপল্লিতে।

দিন পালটেছে, আর সঙ্গে পালটেছে পাচারকারীদের পরিকল্পনা ও কৌশল। এখন ইন্টারনেটের সাহায্যে নানা সোশ্যাল মিডিয়া মারফৎ জাল বিছানো হচ্ছে। আর সেই জালে ধরা পড়ছে অল্প বয়েসি মেয়েরা। প্রযুক্তির আধুনিকতাকে কাজে লাগিয়ে পাচারকারীরা কাজের বিজ্ঞাপন, নয়তো প্রেমের জাল, নয়তো অলীক স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে। গবেষকরা দেখেছেন, আর সেটা প্রকাশিতও হয়েছে। ইউএনওডিসি-র ডেটা সেট অনুযায়ী মোট পাচার হওয়া ৭৯ জনের বিচারাধীন মামলায় দেখা গেছে প্রায় ৫৭ জনের ক্ষেত্রেই দায়ী ইন্টারনেট। ইন্টারনেট প্রযুক্তি পাচারকারীদের অপারেশনের চক্রটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে পাচারকারীরা ফেসবুক, মাইস্পেস, স্কাইপ, হোয়াটসঅ্যাপ এর মতো সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে তাদের মাকড়শার জাল বিস্তার করেছে। সেই জালে আটকে অন্ধকার গলির চোরা স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে একরাশ মানুষ।

পাচারকারীদের রমরমা হবার পিছনে রয়েছে আইনের ফাঁক। ধরা পড়লেও বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে যে অনেকদিন ধরে বিচার চলার পরও পাচারকারীদের কোনও সাজা হয় না। অপরদিকে, সামাজিক সম্মান, লজ্জা ও ভয়ের কারণে পাচার হওয়া মেয়েরা সচরাচর জনসমক্ষে মুখ খুলতে চান না। মহিলা বা নাবালিকাদের ক্ষেত্রে সেই প্রবণতা অনেক বেশি। আর প্রমাণের অভাবে দোষীর কোনও সাজা হয় না। পাচারচক্রের মাসল পাওয়ার ও শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পায়। এখন মহিলারাও পাচারচক্রের দালাল হিসেবে কাজ করছে। দেখা গেছে, অভিযোগের নিরিখে ও সমীক্ষায় যেসব পাচারকারীরা ধরা পড়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ পুরুষ, ৩৫ শতাংশ মহিলা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থানের কাছ থেকে পাওয়া একটি পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ সালের শুরু থেকে আগস্ট পর্যন্ত ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে ধরা পড়া পাচার হয়ে যাওয়া মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৯১৫। ২০১৯ সালে যে সংখ্যা ছিল ৯৩৬, তা ২০১৮-তে ছিল ১,১০৭। গত বছর সীমান্তে ধরা পড়া মোট ৯১৫ মহিলাদের মধ্যে ৮৮৮ জন দক্ষিণবঙ্গ থেকে, ১৪ জন ত্রিপুরা থেকে , ৬ জন অসমের গুয়াহাটি, ৪ জন উত্তরবঙ্গ, ২ জন মিজোরাম ও কাছাড় থেকে এবং মেঘালয় থেকে ১ জন। ■

জলপাইগুড়ি পাচারের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙে বাইরের রাজ্য থেকে এবং সন্নিহিত বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকে প্রচুর পরিমাণ শিশুকে নিয়ে আসা হয়। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পাচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে এসেছে। পাচারের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জীবিকার অভাব, বিশেষ করে এই অতিমারি পরিস্থিতিতে যেটা বেশি করে দেখা দিয়েছে। কর্মহীনতা ও অভাবের তাড়ানায় এইসব ক্ষেত্রের সংক্রমণ বেশি করে ঘটেছে। ২০০৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, সাগর সুন্দবন অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে তারা দেখেছেন, গ্রামের প্রতি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বাড়ির খরচ চলে পাচার হয়ে যাওয়া ১৩ থেকে ১৫ বছরের কিশোরীর রোজগার থেকে। হয় এই কিশোরীরা শহরের কোন বাড়িতে মহিলা পরিচারিকার কাজ করে। নয়তো অন্য কোনো কাজ করে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় যেমন আছেন বিড়ি শ্রমিক, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আছে চা শ্রমিক হিসেবে রোজগারের একটা বড়ো জায়গা। এছাড়াও পরিবারে এখনও মেয়েকে বোঝা বলে মনে করার দরুন, একটু বড়ো হলেই পাত্রস্থ করার দিকে ঝুঁকে পড়ে বাবা-মায়েরা। একটাই উদ্দেশ্য, সন্তান খেয়ে পরে বাঁচবে। দেখা গেছে বিয়ের পর এক বছরের মধ্যেই ওই নাবালিকারা একটি সন্তান নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। নয়তো বা অন্য কোনো রাজ্যে পাচার হয়ে গেছে। আর তাঁদের অনেকের ঠিকানা হয়েছে নিষিদ্ধ পল্লী।

রাজ্যের একেবারে সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রয়েছে পাচারের এক বিশাল রুট। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে গুজরাট আর ওদিকে মহারাষ্ট্র হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে পাচার হয়ে গিয়ে রাখার একটি বিশেষ জায়গা। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, দেখা গেছে গোটা ভারতের মধ্যে পাচারের বড়ো রুট হিসেবে কাজ করে থাকে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। সবচেয়ে বড়ো শহরগুলি হলো, কলকাতা, আসনাসোল, শিলিগুড়ি ও হাওড়া— এই শহরগুলি পাচার হয়ে যাওয়ার বড়ো কেন্দ্র। ২২১৬ কিলোমিটারব্যাপী বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত, ৫০-৬০ কিলোমিটার নেপালের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমা, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক পাচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাচারের জায়গা বর্ধমান, শিলিগুড়ি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ এবং খড়্গপুর। পাচার হয়ে যে রাস্তা ধরে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের সীমানায় সেই জায়গাটি হয় কলকাতা, নয়তো শিলিগুড়ি। আর এই শহর কলকাতার কিছু জায়গায় এনে রেখে, তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুনে, দিল্লি, মুম্বই, বিহার, ঝাড়খন্ড, আমেদাবাদের মতো জায়গায়।

আমাদের রাজ্যে পাচারের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে, সেই জাবালা, শ্রীমার মতো বেসরকারি স্বেচ্ছসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলে মোটামুটি বেশ কয়েকটি কারণ জানা গেছে। ১। দারিদ্রপীড়িত আমাদের এই পারিবারিক সামাজিক ক্ষেত্র, যেখানে জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম স্থায়ী রোজগারের বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, আর এটাই হচ্ছে নারী পাচারকারীদের শিকার ধরার আদর্শ ক্ষেত্র। বিভিন্ন তথ্য বলছে, আমাদের রাজ্যের লাগোয়া বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। এবং তা একেবারেই খোলামেলা। আর এই অবস্থানের জন্য এ রাজ্য শুধু আন্তর্রাজ্য পাচার নয় বরং আন্তর্জাতিক পাচারের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত। পাচারকারীরা দীর্ঘদিন ধরে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে অঞ্চল চিহ্নিত করে তাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেসব পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েই, নয়তো বা প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায়। ফলে এই মাকড়শার জাল কাটা সম্ভব হচ্ছে না কোনোভাবেই। বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া তথ্য বলছে, পাচারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, এরপরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারপর মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, আর সবশেষে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে নেপালিদের পাচার হয়ে যাবার প্রবণতা একটু বেশি। আর পাচারকারীদের নজরে থাকে চা বাগানের শ্রমিক বস্তি। দার্জিলিঙ পাচার করার ক্ষেত্রে একটি মুখ্য এলাকা হিসেবে বিবেচ্য। এখানে বহু নেপালি নারীকে বাড়ির কাজের লোক হিসেবে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পাচার করা হয়। নেপালের বহু সহজ সরল মহিলাকে ভুয়ো পাসপোর্ট করিয়ে দিল্লি বা মহারাষ্ট্রে কাজ দেওয়ার নাম করে পাচার করা হয়। তাদের আদৌ ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দিয়ে দেহব্যবসা করানো হয়। বহু ক্ষেত্রেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাদের দেবব্যবসায় নামানো হয়ে থাকে। অনেক সময় পাচারকারীরা রীতিমতো তাদের ভয় দেখায়। তাদের ও তাদের পরিবারকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে অল্প টাকার বিনিময়ে দেহব্যবসায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করে। উদ্ধার হওয়া নেপালি মহিলাদের বয়ানে এই ভয়াবহ তথ্য শোনা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, নেপালের গ্রামে গ্রামে এ ধরনের আড়কাঠিরা ঘুরে বেড়ায়। অবস্থা বিপন্ন এমন পরিবারকে তারা টার্গেট করে ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সফল হয়। এই মহিলাদের অনেককেই দার্জিলিঙ ও শিলিগুড়ি হয়ে বড়ো মেট্রোপলিটন শহরে নিয়ে আসা হয়। এ ধরনের বহু নেপালি মহিলা কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীতে দেহ ব্যবসায়ের কাজ করছে।

নাবালিকা পাচার ক্রমশ বাড়ছে। বাল্যবিবাহের মাধ্যমে নাবালিকা পাচার এখন মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মালদার মতো জায়গায় এনজিও-রা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই পাচার রোধে। তাঁদের সঙ্গে যদি প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, আর একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদি সচেতনতা সরকারি স্তরে বৃদ্ধি পায়, তাহলে হয়তো এই ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারব আমাদের প্রিয় ঘরের মেয়েটিকে।

(তথ্য সৌজন্য : বিভিন্ন সংবাদমাধম ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমীক্ষা রিপোর্ট)

প্রতি আট মিনিটে একটি শিশু পাচার হয়ে যায় আমাদের দেশ থেকে

অনামিকা দে

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আমার মাতৃভূমিতে সুস্থ আকাশ, সুস্থ সমাজ পারব কী দিতে তাকে, সে অঙ্গীকার কার হাতে? 'শিশু পাচার' বা 'child trafficking'—ভারতবর্ষের মাটিতে এটি আজকের চরম বাস্তব একটি চিত্র, এখানে 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'-র রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক আট মিনিটে একজন শিশু রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যায়। সূর্যের আলো ভালো করে গায়ে মাখার আগেই নিকষ অন্ধকার গিলে ফেলে তার গোটা শৈশবকে। এন.সি.আর.বি.-এর রিপোর্ট বলছে প্রতি বছর ১.৫ কোটি মানুষ পাচার হয়ে যায় ভারতের ভূমিতে, কখনো দেশের অভ্যন্তরেই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আবার কখনও বা দেশের বাইরে। তবে আরও আতঙ্কের বিষয় হলো এই সংখ্যার চল্লিশ শতাংশই হলো আঠারো বছরের নীচে, এমনকী সেই তালিকায় আট-নয় বছরের শিশুও রয়েছে। যদিও আমাদের বঙ্গবাসীদের কাছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো এই গোটা সমীক্ষার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে বসে আছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এতটাই ভঙ্গুর যে এনসিআরবি ২০২০-র রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ শিশু পাচারে শীর্ষস্থান এবং বাল্যবিবাহে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এতে অবশ্য আমাদের নেতা নেত্রীদের বা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ শিশু পাচারকারীদের যে চক্র বা র‍্যাকেট মোটা অর্থের বিনিময়ে এই গোটা ক্রিয়াকলাপটি সম্পন্ন করে সেই টাকার অনেকাংশই প্রশাসন এবং নেতা-নেত্রীদের পকেটস্থ হয়। তবেই তো সম্ভব হয়।

'The trade in human beings, a modern form of slavery,...violates the God-given dignity of so many of our brothers and sisters and constitutes a true crime against humanity.'—Pope Francis.

আধুনিক সভ্য সমাজে দাস প্রথা অব্যাহত আছে মানব-পাচার বা হিউম্যান ট্রাফিকিঙের মাধ্যমে যা মানবতার বিরুদ্ধে এক জঘন্যতম অপরাধ। দৈনন্দিন জীবনে খালি চোখে হয়তো সাধারণ মানুষ তার চারপাশে ঘটে যাওয়া এই ঘৃণ্য কার্যকলাপ দেখতে পায় না। কিন্তু এটাই বাস্তব যে বিশ্বব্যাপী মানব পাচারের শিকার প্রায় ২৪.৯ মিলিয়ন মানুষ যার মধ্যে শিশুসংখ্যা প্রায় চল্লিশ শতাংশ। এটি পৃথিবীর কোনো বিচ্ছিন্ন দেশের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সারা বিশ্বেই প্রতিদিন প্রশাসনের নাকের নীচে ঘটে চলেছে এই অবরাধ।

২০২০-তে সমীক্ষা করা হয় পশ্চিমবঙ্গে, 'Understand Child Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children in West Bengal, India.' সমীক্ষাটি করে 'সিফার' ও 'মাই চয়েসেস ফাউন্ডেশন' এবং এটি কন্ডাক্ট করে সত্য কনসালটিং, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর ২০২০। সমীক্ষাটি মূলত পশ্চিমবঙ্গে তিনটি জেলা বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম এই তিনটি জেলায় করা হয়। এই সমীক্ষার যে কারণগুলি উঠে এসেছে তা হলো মূলত দারিদ্র্য। বহু পরিবারের অভিভাবকরা নিজেরা তাদের সন্তানকে কিছু টাকার বিনিময়ে পাচারকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কোথাও আবার ভিন রাজ্যে কাজ দেওয়ার নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এদের। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি সন্তানকে মানুষ করতে অক্ষম বাবা-মা শিশুকন্যার উন্নত জীবনের আশায় তাদের বাল্যবিবাহ দিয়ে দিচ্ছে। এর ওপর বর্তমান করোনার পরিস্থিতিতে যখন পরিবারের উপার্জনের জায়গাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে একেবারেই তখন আরও বেশি করে শিশু পাচারকারীদের হাতে জেনে বা না জেনেই নিজের সন্তানকে

ফঃ ৪

রেড লাইট এরিয়ার অন্ধকারে

আমার বয়স ২১ । বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, আমরা পাঁচ ভাই-বোন। আমি মেজো। ২০১৫ সালে আমাদের বাড়িতে একজন লোক আমায় কাজ দেবে বলে কলকাতায় নিয়ে আসে। আমার আব্বু আম্মি আমায় তার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু লোকটি আমায় একটা খারাপ জায়গায় (রেড লাইট এরিয়ায়) নিয়ে যায়। যেখানে খারাপ কাজ হয়। ২০১৮-এ আমি সেখান থেকে পালিয়ে আসি। শিয়ালদহে ট্রেনে উঠি কোনোক্রমে, সেখানে এক মহিলা আমায় রান্নার কাজ দেবে বলে ক্যানিংয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও খুব খারাপ কাজ হতো। সেখান থেকে আমায় 'হিন্দু সংহতির' দাদারা উদ্ধার করে এনেছে। এখন আমি এখানেই থাকি। এখানে আমি খুব ভালো আছি। আমার মতো আরও অনেক মেয়ে এখানে থাকে। আমি চাই আমার এই ঘটনা পড়ে সব মেয়েরাই সচেতন হোক। কাজ দেওয়ার নামে এই ধরনের চক্রের থেকে সাবধান থাকুক।

আইন কী বলছে

অ্যাডভোকেট অপূর্ব মণ্ডল বলছেন, কলকাতার বারুইপুর, সোনারপুর, কুলতলি এলাকায় বেশ কয়েকটি র‍্যাকেট কাজ করছে। যারা প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের আলোয় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। তারপর আর তাদের কোনো খোঁজ থাকে না। বাড়ির লোক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে সেখানেও হেনস্থা হতে হয়। তখন আইনের দ্বারস্থ হয়ে উকিলের কাছে আসে। উকিল তখন নোটিশ পাঠায় প্রশাসনকে। প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। তবে এরপর অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনকে কাজ করতে দেখা যায়। বহু ছেলে-মেয়েকে ভিন রাজ্য থেকে উদ্ধার করে আনে তারা। হোমে রেখে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তাদের মানসিক স্থিতি ঠিক করে তবেই বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিশুকন্যা পাচারের ক্ষেত্রে মোটা টাকার বিনিময়ে রেড লাইট এরিয়ায় বিক্রি করা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্য উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়। তবে POSCO (Protection of Child from Sexual Offence) আইনের ভিত্তিতে যে কোনো Minor girl-কে যৌন নিগ্রহ করলে প্রশাসন প্রোটেকশন দিতে বাধ্য। বর্তমানে পিওএসসিও আইনের ভিত্তিতে বহু শিশু পাচারকারী ধরা পড়েছে।

তুলে দিচ্ছে তারা।

তবে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে 'শিশু পাচার, 'শিশু শ্রমিক' এবং 'বাল্যবিবাহ' এগুলির সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে 'সিফার' ও মাই চয়েসেস ফাউন্ডেশন এই দুটি সংস্থা 'সুরক্ষিত গ্রাম কার্যক্রম' নামক একটি ক্যাম্পেনিং করে যাতে শিশুর পরিবার, বৃহত্তর সমাজ অর্থাৎ শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসন, পঞ্চায়েত প্রত্যেকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। এই কর্মসূচিটি নেওয়া হয় স্কুলভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং ওয়ান-টু-ওয়ান কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে। 'শিশু পাচারের' মতো জঘন্য অপরাধকে নির্মূল করতে হলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন হতে হবে। ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি মধ্যযুগীয় দাসত্ব প্রথার অবসান হয়েছে কিন্তু তা যে আধুনিক পথে আরও ভয়ংকর রূপে ফিরে এসেছে আমাদের কাছে, সেই বাস্তবচিত্রটিকে পরিবর্তন করতে আমরাই পারি।

একটি শিশু যখন পাচার হয় তখন তাকে হয় শিশু শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন কলকারখানায় বা ছোটো ছোটো কাজে বা ভিক্ষাবৃত্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিশুকন্যার ক্ষেত্রে আবার তাকে যৌনকর্মী হিসেবে শহরের রেডলাইট এরিয়ায় মোটা দামে বিক্রি করা হয়। এর সবটাই আমাদের জানা কিন্তু আমরা তৎপর হই কতটা? রাস্তায় আমাদের চারপাশে আমরা যখন কোনো শিশুশ্রমিক দেখি আমরা উদাসীনভাবেই সেটিকে অদেখার ভান করে যাই। আসলে চারপাশে ঘটে যাওয়া আর পাঁচটা অন্যায়কে সহ্য করতে করতে সমাজের এই ভঙ্গুর চিত্রটিও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে।

শহরের রাজপথে চলতে চলতে কখনো চোখে পড়ে গাড়ির কাঁচের ওপারে কোনো শিশু ফুল বিক্রেতা হিসেবে দাঁড়িয়ে আবার কখনো কোনো চায়ের দোকানে সে দাঁড়িয়ে চায়ের কোটলি হাতে। ইটভাটায় ইট মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার শিশু পরিচারিকা হিসেবে কাজ করছে কোনো বহুতল ফ্ল্যাটে। ফুলের মতো নিষ্পাপ জীবন বঞ্চিত হচ্ছে শৈশব কৈশোরের সকল চাওয়া-পাওয়া থেকে। শিক্ষার আলো পৌঁছয় না তার অন্ধকার জীবনে। অশিক্ষা, অপুষ্টিতে ভুগছে আমাদের আগামী প্রজন্ম, এটা আমাদের সবচেয়ে বড়ো লজ্জা। নবজাতকে সুস্থ সমাজ, সুস্থ জীবন দেওয়া কী আমাদের সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাটি মনে পড়ছে—

চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব— তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি— নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। ▮

বালিকাবধূর সংখ্যায় এগিয়ে বাঙলা

তরুণ কুমার পণ্ডিত

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই ভবিষ্যৎকে যদি স্বাস্থ্য পরিষবা ও সুরক্ষিত পরিবেশ না দেওয়া যায়, যদি তারা পড়াশোনা ও উন্নয়নের পরিবেশ না পায় তাহলে এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশুরা কখনোই সুস্থ নাগরিক হয়ে উঠবে না। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি সরকারি উদ্যোগ ও প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার পরেও বাল্যবিবাহ মোটেও বন্ধ হয়নি বরং গ্রাম এলাকায় এই সামাজিক ব্যাধি ক্রমবর্ধমান।

যদিও ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকার আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ-সহ ভারতে অল্প বয়সি শিশু কন্যার বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কমেনি। সারা ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বিশেষ উদ্বেগজনক। সম্প্রতি ইউনিসেফের একটি রিপোর্ট বলছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, রাজস্থান ও হরিয়ানার মতো রাজ্যে এখনও ৪০ শতাংশ বাল্যবিবাহ হয়। এরকম চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছানোর আগে দেশে দেড় কোটি নাবালিকার বিয়ে হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সাধের কন্যাশ্রী প্রকল্পটি নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন সমীক্ষা বলছে হরিয়ানা, রাজস্থান ও বিহারকে পেছনে ফেলে বাল্যবিবাহে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে প্রথম স্থান দখল করেছে। জেলাগুলোর মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই দিনাজপুর, দুই চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়াতে এই শিশু বিবাহের হার বেশি।

অভিশপ্ত ২০২০-২১

২০২০ এবং ২০২১। কোভিডের এই দুটি বছর অভিশপ্ত তো বটেই। করোনা ভাইরাসের ছায়া পড়েছে গ্রামবাঙ্গলার মেয়েদের জীবনেও। এরা সকলেই গরিব। মোবাইল ল্যাপটপ নেই। তাই অনলাইন ক্লাসেও এরা অনুপস্থিত। স্কুল যখন বন্ধ তখন কী করবে? অভিভাবকেরা জোর করেই বিয়ে দিচ্ছেন এইসব আঠারোর কম বয়েসি মেয়েদের। এখনও পর্যন্ত ১২টি এরকম ঘটনা ঘটেছে।

জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৫)

আপনার অতি আদরের মেয়েটি ঠিকমতো বেড়ে উঠছে তো? এই প্রশ্নের উত্তর দেয় জতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা। এই সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ৪১.৬ শতাংশ মেয়ের ১৮-য়ে পা দেবার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। ২০১৫-১৬ সালের রিপোর্টেও হিসেবটা একইরকম ছিল। অর্থাৎ কন্যাশ্রীর ঢক্কানিনাদের আড়ালে চাপা দেওয়া হয়েছে প্রকৃত সত্য। গ্রামবাঙ্গলায় অপরিণত বয়েসে মেয়েদের বিয়ের ঘটনা ঘটে অনেক বেশি, ৪৮.১ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ২৬.২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন মেয়ের মধ্যে ৪ জনেরই বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরের কম বয়েসে।

তবে এদের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় বাল্যবিবাহ সবচেয়ে বেশি। লক্ষণীয় বিষয় হলো দেশের অন্যান্য রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার যেখানে ১০ শতাংশ কমেছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই কমার হার মাত্র ৪ শতাংশ। আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বাল্যবিবাহ সবচয়ে বেশি হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ আমলে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড শরিয়ত মতে মুসলমান কন্যাদের বাল্যবিবাহে সায় দেয়। এখনও কিছু ভারতীয় মুসলমান সংস্থা চাইছে মেয়েদের বিয়ের নিম্নতম বয়স না রেখে সেটা তাদের ব্যক্তিগত আইনে ছেড়ে দেওয়া হোক। ২০১২ সালে কেরল রাজ্যের মাল্লাপুরম জেলায় ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৩৪ হাজার বিয়ে হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৮ হাজার মুসলমান। সেখানে মুসলিম লিগ ব্যক্তিগত আইনে (শরিয়ত) মুসলমান মহিলাদের বিয়ের বয়স নির্ধারণের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আদালত পর্যন্ত গিয়েছিল। অর্থাৎ এই রাজ্যে মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা যেমন সর্বাধিক, তেমনই অধিক সন্তাদের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাও বেশি। হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা একসময়ে ছিল এবং বিদ্যাসাগর ও রামমাহনরা তার জন্য লড়াই করেছিলেন। প্রসঙ্গত, একটি নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদ ও পণ্ডিতদের কথায়, ভারতে এক হাজার বছরেরও আগে মুসলমান আক্রমণের সময় বাল্যবিবাহ শুরু হয়েছিল। আক্রমণকারীরা অবিবাহিত হিন্দু মেয়েদের বলাৎকার করতো অথবা লুটের মাল হিসেবে জোর করে তুলে নিয়ে যেত। ফলে হিন্দু সমাজে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য প্রায় জন্ম থেকেই বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা শুরু হয়েছিল। দিল্লি সুলতানি আমলে সুলতানরা বাল্যবিবাহ অভ্যাসে পরিণত করেছিল এবং মেয়েদের পর্দার আড়ালে যেতে বাধ্য করেছিল।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারিভাবে বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এবং শহরাঞ্চলে এই কুপ্রথা অনেকটা কমলেও গ্রামে মোটেও কমেনি। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানো সত্ত্বেও কোনোভাবেই তা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে আজকাল হাসপাতালে যেসব শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে তার বেশিরভাগই নাবালিকা ও অশিক্ষিত বাল্যবধূর অপরিণত গর্ভধারণ। এছাড়া সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুর ঘটনা তো রয়েছেই।

নাবালিকা বিয়ে বন্ধের পরেও প্রশ্ন থেকেই যায়। মুচলেকা নেওয়ার পরেও কিছুদিন বাদে লুকিয়ে সেই মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, তার নিশ্চয়তা কি প্রশাসন দিতে পারবে? সরকারি একটি সূত্র মারফত জানা গেছে, বিগত দু'বছরে অতিমারির কারণে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকাকালীন মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুর জেলায় অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে। যদিও এখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোনো উল্লেখ নেই কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কোন সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই কুপ্রথা শিকার হয়ে দেশ ও জাতির সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। ■

হর-গৌরীর বিবাহের স্মৃতিবিজড়িত মীনাক্ষী মন্দির

কৌশিক রায়

মন্দিরময় দক্ষিণ ভারতে বৃহদেশ্বর, চেন্নাকেশব, তিরুপতি তিরুমালা, হোয়সলেশ্বর, মামল্লপুরম, গুরুভায়ূরের মতো মন্দিরগুলি তাদের চিরায়ত, ধর্মীয় সুষমা এবং অননুকরণীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের জন্য বিশ্বখ্যাতি পেয়েছে। সেই মন্দিরময় ভারতীয়ত্বের সুবর্ণমহলে অবশ্যই ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতা ও স্থাপত্যের উৎকর্ষের পরিমিতিতে স্থান করে নিতে পারে তামিলনাড়ুর ভাইগাই নদীর দক্ষিণ তীরে মাদুরাই শহরে অবস্থিত একাদশ-দ্বাদশ শতকে রাজা কুলসেকারা পাণ্ড্যর দ্বারা নির্মিত দেবী পার্বতী বা মীনাক্ষীদেবীর মন্দির।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে তামিল ভাষাতে শৈবনারায়ণ স্তোত্রাবলী রচিত হয়েছিল। সেই স্তোত্রাবলীতে দ্বাদশ শিব জ্যোতির্লিঙ্গের মতোই ২৭৫টি শিবমন্দিরের কথা (পাদাল পেত্রা স্থলম) বলা হয়েছে। মীনাক্ষীদেবীর স্বামীও তামিল 'সঙ্গম' সাহিত্য ধারাতে বন্দিত 'সুন্দরেশ্বর' শিব সেই দেবতাদের মধ্যেই একজন। এই চক্রধারী শিবের উপাসনা করার জন্যই সন্ন্যাসী রাজা ও কবি কুলসেকারা পাণ্ড্য মাদুরাইয়ের এই মীনাক্ষী মন্দিরের সামনে একটি ত্রিতলবিশিষ্ট প্রবেশদ্বার বা গোপুরম নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মীনাক্ষীদেবীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'অম্বিকাই মালাই' নামক একটি কবিতাও লিখেছিলেন কুলসেকারা পাণ্ড্য। মীনাক্ষীদেবী ও মহাদেব ছাড়াও এই মন্দিরে নটরাজ শিব, সূর্য, আইয়ান্নার, বিনায়াগার, কালী ও কারিয়াম্মালপেরুম্মল নামক দেব-দেবীর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহও নির্মাণ করান এই রাজা। একটি বিশাল উপাসনাস্থল বা 'মহামণ্ডপম' মীনাক্ষী মন্দিরের ভিতরে নির্মিত হয়। বিজয়নগর-দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মীনাক্ষী মন্দিরের 'অবনীবেন্দারামান' বা 'থিরুক্কোপুরম' নামক গোপুরমটি নির্মাণ করান মরবর্মণ প্রথম সুন্দারা পাণ্ড্যিয়ান নামক নৃপতি। তাঁর পরবর্তী নৃপতি 'মুত্তালাক্কুম ভাইয়িল' নামক আরেকটি গোপুরম, এই মন্দিরের অংশ রূপে নির্মাণ করান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মীনাক্ষী মন্দিরটির গ্রানাইট পরিকাঠামোর কিছুটা ক্ষতি হয়।

১৬০০ সাল নাগাদ মন্দিরটির সংস্কার করান পাণ্ড্য রাজাকুমার কৃষ্ণাপ্পা। কদম্বগাছের জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি করা হয় এই মীনাক্ষী মন্দির। মৎস্যচক্ষু মীনাক্ষীদেবীকে তামিল ভাষাতে বলে 'থাড্ডাকাডাই'। মীনাক্ষীদেবীকে তামিলভাষাতে সুন্দর মৎস্য চক্ষু বিশিষ্ট দেবীমাতা বা 'আঙ্কাইয়ারকান্নাম্মাই' নামেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুরের

হাতে মীনাক্ষী মন্দির চতুর্দশ শতকে লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রাজা বিশ্বনাথ নায়াক্কার মন্দিরটিকে আবার সাজিয়ে তোলেন। বর্তমানে মীনাক্ষী মন্দিরে ৫০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ১৪টি গোপুরম এবং ১০০টি স্তম্ভযুক্ত একটি সভাগৃহে (আইরিয়াক্কাল) আছে। এই মন্দিরে মীনাক্ষীদেবীর ভ্রাতা রূপে দেব বিষ্ণু, রুক্মিণী, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও সরস্বতী পূজিতা হন। এপ্রিল-মে মাসে ১০ দিনের তিরুকল্যাণম উৎসবে সেজে ওঠে মীনাক্ষী মন্দির।

প্রাচীন ইতিহাসের ব্যাখ্যা :

মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরটি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের থেকে কিছুটা আলাদা। অন্য দেবালয়গুলিতে দেবতা শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য বেশি। মীনাক্ষী মন্দিরের প্রধান পুজিতা দেবী হলেন পার্বতী। তামিল ধর্মগ্রন্থ— 'তিরুভিল্লাইযাত্রাপুরাণম' থেকে জানা যাচ্ছে— রাজা মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এবং তাঁর মহিষী কাঞ্চনামালাই বংশরক্ষার জন্য পুত্রকামেষ্ঠী যজ্ঞ করেন। তবে, তাঁদের আশাভঙ্গ করে যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে ত্রিস্তনী তিন বছরের এক সুরূপা কন্যার আবির্ভাব ঘটে। দেবাদিদেব মহাদেব রাজা-রানিকে স্বপ্নদর্শনে জানান— এই কন্যাটিকেই যেন তাঁরা পুত্রের মতো সর্বশাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শিনী করে তোলেন। কন্যাটির সঙ্গে যখন তার ভবিষ্যৎ স্বামীর দেখা হবে তখনই তার তৃতীয় স্তনটি লুপ্ত হবে। ভবিষ্যতে সেই কন্যাটিই রাজ্যের নিয়ামক হলেন। ভবিষ্যৎ স্বামী দেবাদিদেব মহেশ্বরের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। তখনই তাঁর তৃতীয় স্তনটি লুপ্ত হলো। মানবীরূপিণী এই কন্যাটিই হলেন পার্বতী বা মহেশ্বরী। ইনিই মীনাক্ষী রূপে পূজিতা। এই বাগ্‌দান সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের মাতৃতান্ত্রিক সমাজকেই চিহ্নিত করছে। দাক্ষিণাত্যের রাজনীতি এবং রাজ্যশাসনেও এক সময় রাজমহিষীদের কথা নৃপতিরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। ইতিহাসবিদ সুসান বেইলির মতে মীনাক্ষী দেবীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক সমাজে নারীদের প্রাধান্যকেই চিহ্নিত করে।

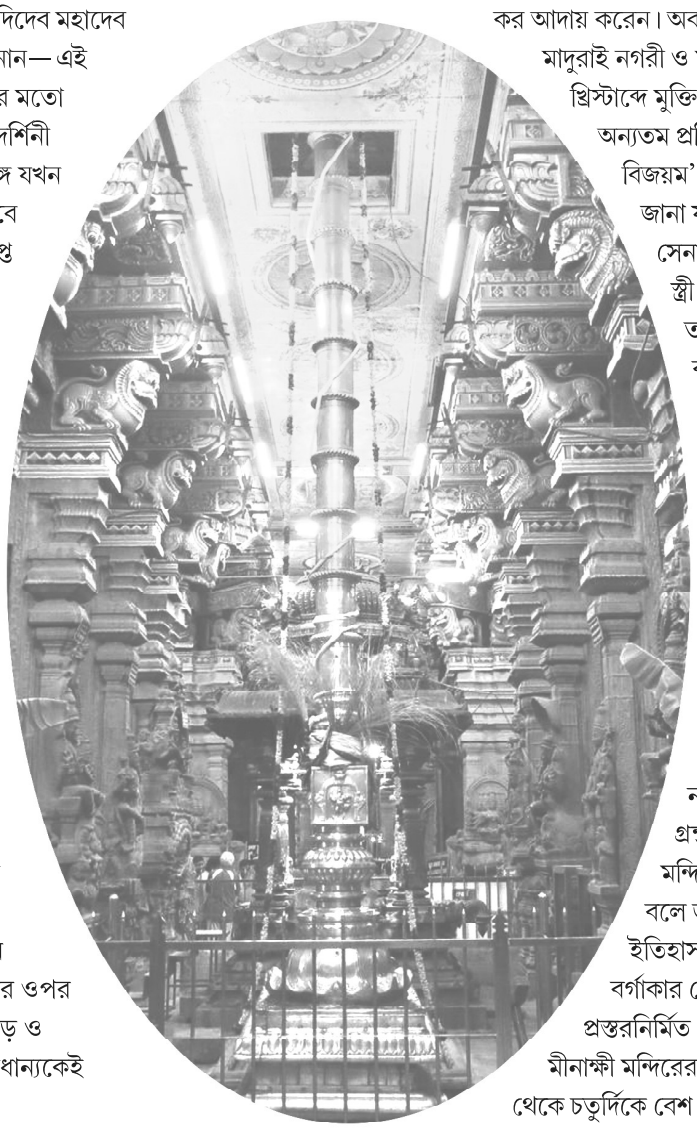

সঙ্গম সাহিত্যে মীনাক্ষীদেবী :

প্রথম থেকে চতুর্থ খ্রিস্টীয় শতকে রচিত 'সঙ্গম' সাহিত্যে মাদুরাই নগরীর নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে মাদুরাই নগরীকে 'কুদাই' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই নগরীর রক্ষয়িত্রী এবং পালনকর্ত্রী হিসেবে মীনাক্ষীদেবীকেই সম্মান করা হয়। প্রাচীন তামিল সাহিত্য থেকে এটাও জানা গেছে— পাণ্ড্য নৃপতিদের উপাস্যা দেবী ছিলেন মীনাক্ষী। সপ্তম খ্রিস্টীয় শতকে বিখ্যাত হিন্দু সাধক— তিরুজ্ঞান-সাম্বান্দর মাদুরাই শহরের বর্ণনা দেন এবং মীনাক্ষীদেবীকে 'আল্লাভাই ইরাইবান' নামে অভিহিত করেন। মীনাক্ষীদেবীকে যোদ্ধারূপিণী দেবী হিসেবেও একসময় মাদুরাইতে পূজা করা হতো।

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বারা নিয়োজিত প্রাদেশিক শাসনকর্তা— জালালুদ্দিন আহ্‌সান খাঁ মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরের সংস্কারসাধনে বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি, উপরন্তু মন্দিরে ভক্তবৃন্দ এবং সেবায়েতদের কাছ থেকে অত্যধিক পরিমাণে ধর্মীয় কর আদায় করেন। অবশেষে সুলতানি শাসন থেকে মাদুরাই নগরী ও মীনাক্ষী মন্দিরকে ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি দেন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বুক্কা রায়। 'মাদুরা বিজয়ম' নামক তামিল গ্রন্থ থেকে জানা যায়— বুক্কা রায়ের অন্যতম সেনাপতি কুমার কম্পনের বীরাঙ্গনা স্ত্রী গঙ্গাদেবী তাঁর স্বামীর হাতে তরবারি তুলে দিয়ে বলেছিলেন —মাদুরাই মন্দিরকে বিধর্মী মুসলমান শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপর থেকে মাদুরাই মন্দির পুনর্নির্মাণের দিকে নজর দেন বিজয়নগরের রাজারা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মাদুরাই মন্দিরের পুনর্গঠন কার্য চালু রাখেন রাজা বিশ্বনাথ নায়ক। 'শিল্প শাস্ত্র' নামক স্থাপত্যরীতি নির্দেশক গ্রন্থকে মেনে এই মাদুরাই মন্দিরের নির্মাণকার্য করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন পোলিশ-মার্কিন ইতিহাসবিদ সুসান লিউয়ান্ডৌস্কি। বর্গাকার বেদীর চারপাশে বৃত্তাকার, প্রস্তরনির্মিত পথ রচনা করা হয়েছিল মীনাক্ষী মন্দিরের গঠনকালে। এই মন্দিরটি থেকে চতুর্দিকে বেশ কয়েকটি রাস্তা বেরিয়ে

এসেছে। তামিলভাষায় মাসের নামানুসারে রাস্তাগুলির নামকরণ করা হয়েছে— অধি, চিত্রই, অবনী-মূলা, মাস্‌সি ইত্যাদি। সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করেও মাদুরাই মন্দিরের একটি গোপুরম নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের চারদিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্ষত্রিয় যোদ্ধাসমাজ ও বৈশ্য গোত্রভুক্ত ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা আবাসন তৈরি করা হয়েছিল। মাদুরাই মন্দিরে বিষ্ণুর উপাসনার্থে বসন্ত উৎসবের জন্য একটি বিশেষ কারুকার্যময় মণ্ডপ তৈরি করেছিলেন রাজা তিরুমালা নায়ক। মন্দির পুষ্করিণীর অভিমুখে অলিন্দ এবং 'মিনাচ্চি নায়াক্কার মণ্ডপম্' নামক আরেকটি সমাবেশ স্থল তৈরি করান রানি মাঙ্গাম্মাল। মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ কার্যে অনেকটাই সহায়তা করেন 'নায়ক' রাজবংশের প্রধানমন্ত্রী— আর্যনাথ মুদালিয়ার। সপ্তদশ শতকের তামিল কবি— কুমারাগুরুপ্পুরুরের 'মীনাক্ষী পিল্লাইতামিল' গ্রন্থে নায়ক রাজবংশের ধর্মভীরুতা ও মীনাক্ষী মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করা হয়েছে। মন্দির দেওয়ালচিত্রে দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাসমূহের ৬৪টি চিত্র খোদাই করা আছে।

১৮৯৫ সাল নাগাদ 'নাদার' সম্প্রদায় এবং রামনাদের রাজার মধ্যে মীনাক্ষী মন্দিরে উপাসনার অধিকার নিয়ে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ শাসক এবং কেন্দ্রীয় আদালতের হস্তক্ষেপে এই বিসংবাদের নিষ্পত্তি হয়।

মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরটি মোটামুটি আয়তাকার, প্রায় ১৪ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মন্দিরটির চারদিকে সুরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলেন সেনাপতি কুমার কপ্পন। রাজা চেট্টিয়াপ্পা নায়াক্কার মন্দিরটির মধ্যস্থলে অবস্থিত পদ্ম সরোবরটি তৈরি করান। মাদুরাই মন্দিরে ১৪টি প্রবেশদ্বার বা গোপুরম আছে। এগুলির মধ্যে দক্ষিণ প্রবেশদ্বারটির উচ্চতা ১৭০ ফিট। পূর্বদিকের গোপুরমটি সবচেয়ে পুরোনো। রাজা মরবর্মণ সুন্দর পাণ্ডিয়ান এই গোপুরমটি নির্মাণ করান। মন্দিরের একটি পিরামিড সদৃশ গোপুরম প্রায় ১০ তলা উঁচু। গোপুরমগুলির প্যানেলে পাথর খোদাই করা দেব-দেবীর ছোটো ছোটো মূর্তি— ভাস্কর্যময় ভারতের সজীব উদাহরণ। এগুলির মধ্যে চারস্তর বিশিষ্ট একটি গোপুরম ১২২৭ সালে তৈরি করেছিলেন ভেম্বাতুরারা আনন্দ নাম্বি। সুন্দরেশ্বর উপাসনাগৃহের পূর্বদিকে অবস্থিত গোপুরমটি ৬ স্তরবিশিষ্ট। ১৩৭২ সালে এই প্রবেশদ্বারটির নির্মাণকার্য শেষ করান বিজয়নগরের শাসক বাসবাপ্পান। মীনাক্ষীদেবী আর সুন্দরেশ্বর মন্দিরের মাঝামাঝি অবস্থিত নাদুকাট্টু গোপুরম। ছয় স্তরবিশিষ্ট ইদাবাক্কুরি গোপুরম এবং রাজা কৃষ্ণাপ্পা নায়াক্কারের নির্মিত মোত্তাই গোপুরমটিও মীনাক্ষী মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর শিবের উপাসনালয় পূর্বমুখী। বজ্রাসনে উপবিষ্টা মীনাক্ষীদেবীর হাতে ধরা পদ্মফুলের ওপর একটি সবুজ তোতাপাখি উপবিষ্ট। সোমস্কন্দ রূপে সুন্দরেশ্বর শিব মাদুরাই মন্দিরে স্থাপিত রয়েছেন। এই দুই উপাসনালয়কে গড়ে তুলতেই প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও মণিমুক্তা দান করেছিলেন কুমার কপ্পন। মন্দিরে শিব-পার্বতীর জন্য একটি শয্যাকক্ষ (পালিয়ারাই) তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে মীনাক্ষী মন্দিরে নটরাজ শিবের মূর্তি তৈরি করান আরুলালান সেবাহাদেভান ভানাথিরাইয়ান। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণাপ্পা নায়াক্কার মীনাক্ষী মন্দিরে দেবসেনাপতি কার্তিক বা মুরুগানের মূর্তি একটি গোটা পাথর (মোনোলিথ) থেকে তৈরি করান। মন্দিরটির সপ্তসিন্ধু বা 'এঝুক্কাদাল' নামক সরোবরটি পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য ১৫১৬ সালে তৈরি করেন বিজয়নগর রাজ্যের প্রাদেশিক প্রশাসক— সালুভানারাসানা নায়ক। একটি ছয় স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ (উত্তাল) তৈরি করান চেভেনেত্থি মূর্তি চেট্টি। মীনাক্ষী মন্দিরের অষ্টশক্তিমণ্ডপে আছে

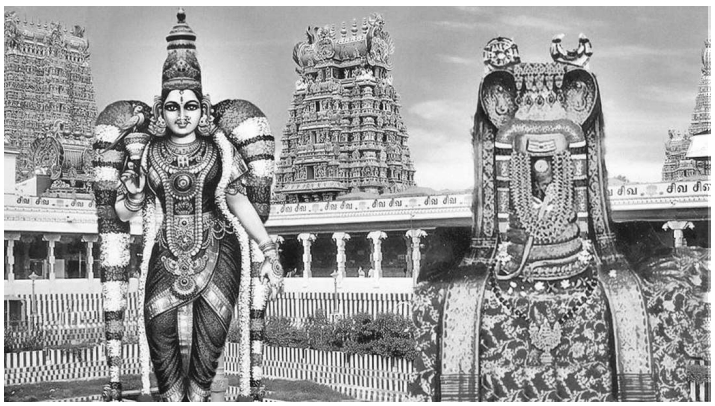

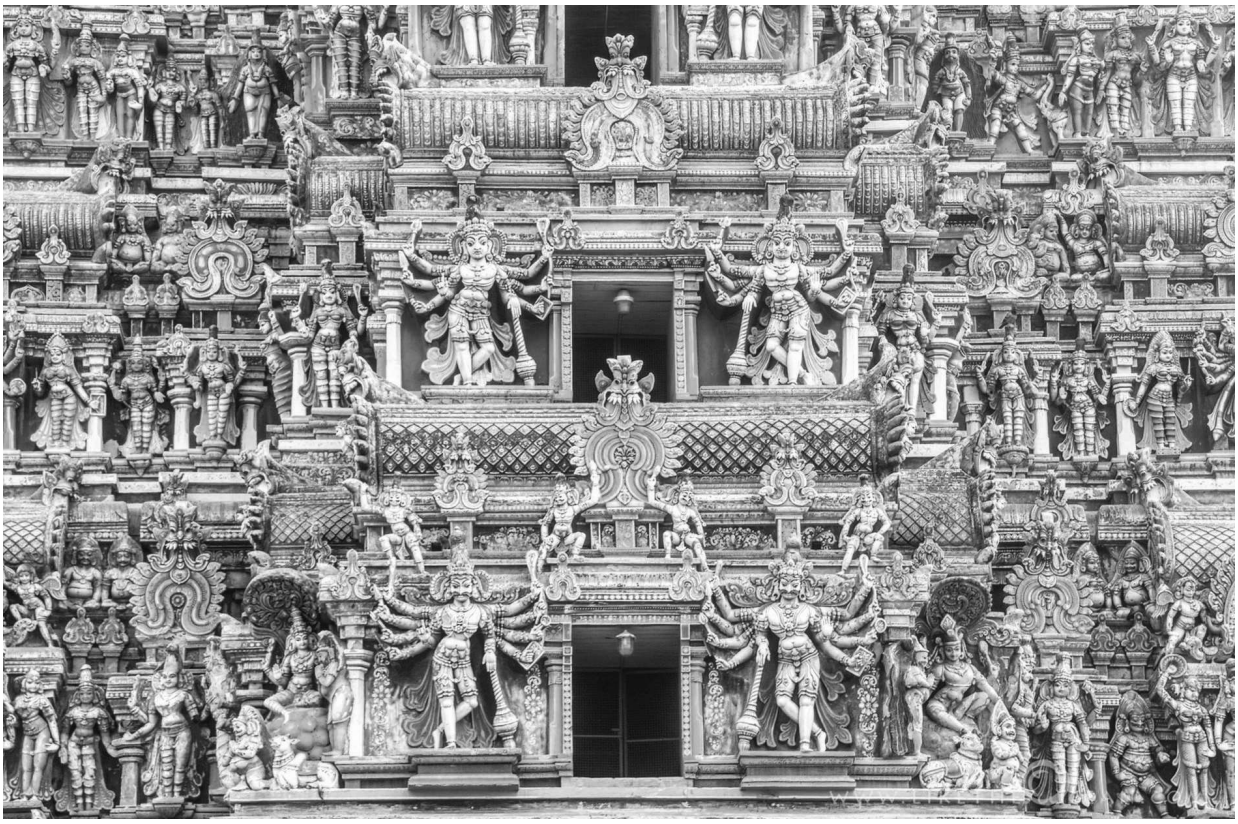

কৌমারী, রৌদ্রী (রুদ্রানী), বৈষ্ণবী, মহালক্ষ্মী, যজ্ঞরূপিণী, শ্যামলা, মহেশ্বরী ও মনোন্মানী নামক আটজন দেবীর খোদিত মূর্তি।

তোতাপাখি মণ্ডপ :

১৬২৩ সালে মীনাক্ষী মন্দিরের গর্ভগৃহের কাছে 'তোতাপাখি মণ্ডপ' (কিল্লিকুন্ডু বা সাংগিলি মণ্ডপম) তৈরি করান বিজয়নগর রাজ্যের মন্ত্রী মুথু বীরাপ্পা নায়াক্কার। এই স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপে খাঁচার মধ্যে তোতাপাখি রেখে তাদের 'মীনাক্ষীদেবী' বলা শেখানো হতো। বর্তমানে মেয়েরা এখানে বাঁশের লাঠি, লম্বা দড়ি নিয়ে শারীরিক কসরতের সঙ্গে 'কোল্লাত্তাম' নাচ করেন। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার চিত্রাবলী আছে এই মণ্ডপের দেওয়ালগাত্রে। এখানে একটি স্তম্ভের ওপর একজন 'ইয়াল্লি' বা যক্ষিণী মূর্তি আছে। মূর্তিটির মুখে বসানো আছে একটি পাথরের বল। বলটি হাওয়ার টানে ঘুরতেও পারে। মীনাক্ষী মন্দিরে 'মন্দিরবৃক্ষ মণ্ডপ' (কাম্বতাদ্দি মণ্ডপম)-এ মহাবোবাহন নন্দীর মূর্তি ও নৃত্যরত শিব-কালীর মূর্তি আছে। মীনাক্ষী মন্দিরের 'গোল্লু মণ্ডপম' নির্মাণ করেন ১৫৬৫ সালে একজন অনামী সাধারণ মানুষ। নবরাত্রি উৎসবের সময় নয়টি ভিন্নরূপিণী পুতুল দিয়ে এই মণ্ডপ সাজানো হয়। নয়টি দিনের প্রতীক ওই পুতুলগুলি। মীনাক্ষী মন্দিরে ৯৮৫টি স্তম্ভযুক্ত একটি মণ্ডপ আছে। স্তম্ভগুলিতে রতিদেবী, কার্তিকেয়, গণেশ ও পরিব্রাজক ভিক্ষুর ছদ্মবেশে মহাদেবের মূর্তি খোদাই করা আছে। মীনাক্ষী মন্দিরের ছয়টি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ (উচ্ছব নায়ানার মণ্ডপ) পঞ্চদশ শতকে তৈরি করান সুন্দরাতোলিআদিত্য মাভালি ভানাথিরাইয়ার। ১৬১৩ সালে মীনাক্ষী মন্দিরে মুদালি পিল্লাই বা ইরুত্থু মণ্ডপম নামে একটি প্রশস্ত ও লম্বা সভাকক্ষ তৈরি করান মুথু পিল্লাই। এছাড়াও, তামিল ভাষা ও শৈবধর্মের পৃষ্ঠপোষিকা রানি মাঙ্গাইয়ারকারাসাই মীনাক্ষী মন্দিরে আরেকটি মণ্ডপ নির্মাণ করেন।

মীনাক্ষী মন্দির হর-গৌরীর মূর্তিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে পবিত্র এবং অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন বহু নবদম্পতি। তাঁরা মনে করেন— এই মন্দিরকে সাক্ষী রাখার অর্থ— স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সম্মান করবেন, পারস্পরিক ও ভদ্রস্থ স্বাধীনতার মর্যাদা দেবেন, পরস্পরকে কটু কথা বলবেন না এবং কখনোই একে অপরকে পরিত্যাগ করবেন না। এই মন্দির শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। 'থিরুভাল্লাইথাম পুরাণম' নামক তামিল ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী— ভারতের ৬৮টি শিবমহিমামূলক তীর্থস্থানের মধ্যে অন্যতম হলো এই মাদুরাই। এই মীনাক্ষী মন্দিরে মহাজাগতিক নৃত্যরত শিবের নটরাজ মূর্তি (ভেল্লি আম্বালাম) একটি বিশাল রূপের বেদিতে বসানো আছে।

মীনাক্ষী আম্মান মন্দিরে দেবী মীনাক্ষীর ধাতু-নির্মিত প্রতিরূপ নিয়ে রথযাত্রা বের হয়। এছাড়া প্রতিদিন পুরোহিতরা মীনাক্ষীদেবী ও সুন্দরেশ্বর শিবের অভিষেক, অলঙ্গরম, নৈভেথানম (ভোগ নিবেদন) এবং দীপ আরাধনা (আরতি) করে থাকেন। এছাড়াও মীনাক্ষী থিরুকল্যাণম, মুল্লাই-কোত্তু এবং অবনী মুলাম অবনী উৎসবগুলিও মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যশালী মন্দিরে। ◻

প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে যেখান হতে স্বপ্ন নামে

ড. তরুণ মজুমদার

কার্তিক মাস এসেছে। সারা রাত দালানে বা উঠানে আকাশ প্রদীপের নরম আধো-অন্ধকারময় স্নিগ্ধ আলো বেয়ে হিমের প্রলেপ নেমে আসে দূর্বা ঘাসের উপর। পরমযত্নে জমা হওয়া সেই হিমের পরশ দিয়েই তো বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে ভাইফোঁটা দেন। ভাইফোঁটা বাঙ্গালির ঘরে মহাসমারোহে পালিত হলেও অজস্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ আমরা ভুলতে বসেছি। ঠিক যেমন আকাশ প্রদীপ।

আসলে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি চরম অবহেলা করতে করতে আজ আমরা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি যে বর্তমান প্রজন্ম আকাশপ্রদীপ কী, তা জানেই না। অথচ কয়েক দশক আগেই মান্না দে 'জ্বালাও আকাশ-প্রদীপ শান্ত এ হেমন্ত সন্ধ্যায়' গেয়ে গেছেন। লতার কণ্ঠে 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে'— গানটিতেই বর্তমানে আকাশপ্রদীপের অস্তিত্ব বিদ্যমান কিন্তু সমাজে তা অবলুপ্তপ্রায়। এ জগতে প্রত্যেকটি জাতিরই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে এবং এই বহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই ইতিহাস ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে জাতিকে আত্মবিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করে। হ্যালোউইন সংস্কৃতিকে সাগ্রহে আত্তীকরণের মাধ্যমে আমরা চরম অবহেলায় আকাশপ্রদীপকে দূরে ঠেলে দিয়েছি। ঋদ্ধ ঐতিহ্য বিমুখ হয়ে দেউলিয়াপনায় জারিত হতে হতেই আজ না হয় আকাশপ্রদীপের ঐতিহ্য নিয়েই একটু গল্প হয়ে যাক।

আকাশপ্রদীপ একটি পবিত্র আলোর পথ, যে পথে আত্মজের তর্পণে তৃপ্ত

পূর্বপুরুষের শাশ্বত আত্মা ফিরে যায় নিজলোকে। গ্রামবাঙ্গলায় প্রাচীনকাল থেকেই কার্তিক মাস জুড়ে আকাশপ্রদীপ প্রজ্বলনের রীতি চলে আসছে। তবে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামবাঙ্গলায় আকাশপ্রদীপ প্রজ্বলনের প্রথা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। সন্ধের মুখে পঁচিশটি গাঁট যুক্ত লম্বা বাঁশের আগায় রাতভর একটি প্রদীপ জ্বেলে রাখা হতো। আজ এ গ্রামবাঙ্গলায় কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে এই প্রথা চলে আসছে; যদিও বৃহত্তর সমাজে বর্তমানে তা অপ্রাসঙ্গিক। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মহালয়ার পুণ্য লগ্নে উত্তর পুরুষের কাছে জলের প্রত্যাশায় পরলোকগত পূর্বপুরুষেরা ফিরে আসেন মর্ত্যের মায়ায়। আত্মজের তর্পণে তৃপ্ত হয়ে তাঁরা ফিরে যান নিজলোকে আলোর পথ ধরে। আকাশপ্রদীপই হলো সেই আলোর পথ। যেহেতু এই সময় মাঠে ধান পাকতে শুরু করে তাই অনেকে মনে করেন আকাশপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে লক্ষ্মী-নারায়ণের আশীর্বাদ যাচনা করা হয় যাতে শুভশক্তি আলোতে পথ চিনে গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করতে পারে। অন্য মতে এই কার্তিক মাসে খেত থেকে শস্য নির্বিঘ্নে তোলার জন্য গৃহস্থরা, দেবসেনাপতি কার্তিকের শরণাপন্ন হন। আকাশপ্রদীপ আসলে দেবসেনাপতি কার্তিককে দেখানোর জন্য জ্বালানো হয় যাতে তিনি মাঠের ফসল পাহারা দিতে পারেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা বলা যেতেই পারে যে, শ্যামা পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতেই একমাস ধরে আকাশপ্রদীপ প্রজ্বলনের প্রথা চালু হয়। কারণ শ্যামাপোকা আলোর উৎসে জড়ো হয় এবং তারপর মারা যায়।

তবে কেন, কবে বা কার উদ্দেশে আকাশপ্রদীপের প্রচলন শুরু হয়েছিল— সে সুলুকসন্ধান বাদ দিয়ে বরং ভেবে দেখা উচিত কেন এই ঐতিহ্য আজ ব্রাত্য হয়ে পড়েছে? সে কি লোকদেখানো আধুনিকতার মোহে; যে মোহ নব প্রজন্মকে কুমড়ো নিয়ে আদিখ্যেতা করে ভুত সাজতে শেখায়! সত্যিই এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ভেবে দেখবো না, আমরা ভবিষ্য বংশীয়দের জন্য কী রেখে যাচ্ছি? একদিকে মেকি আধুনিকতার মোহে নিজের শিকড়-ইতিহাস-ঐতিহ্যকে স্বেচ্ছায় ভুলে যাওয়া আর অন্যদিকে অসহনীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন— এই দুই বিষাক্ত জোড়া ফলার সামনে আমার আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে তো? ক্ষণিকের ভালো থাকার জন্য জাতির এত বড়ো সর্বনাশ এই বিশ্বে হয়তো একমাত্র আমরাই করতে পারি। হ্যাঁ, আমরাই বাঙ্গালি হিন্দু। মাটির প্রদীপের আলোতে আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই না, চীনা লাইটের তাণ্ডবে রাতের নৈসর্গিকতাকে নিঃস্ব করেই উল্লাস। মেকি আধুনিকতার মোহে দেউলিয়া ও বন্ধকীকৃত বৌদ্ধিক ক্ষমতায় আমরা জানতেই পারি না লাইট পল্যুশন বলেও একটি বিষয় আছে।

তালিবানদের হাত থেকে রেহাই পাবে না পাকিস্তানও

জঙ্গিদের মদত দিতে গিয়ে ইমরানের নেতৃত্বাধীন পাক সরকারের অবস্থা এখন শাঁখের করাতে আটকে যাওয়ার মতো। না পারছে ফেলতে, না পারছে গিলতে। দিন যত গড়াবে ভস্মাসুর জঙ্গিদের হাত ততই চেপে ধরবে পাকিস্তানের গলা।

দুর্গাপদ ঘোষ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম সাধারণ সভায় মাত্র ২২ মিনিট বক্তব্য রাখেন ভারতের তেজস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। '৫৬ ইঞ্চি ছাতি' (বুক) চিতিয়ে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যারা সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে তারা যেন মনে রাখে যে সন্ত্রাসবাদ তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও সমান বিপজ্জনক। মোদী কোনো দেশের নাম করেননি। কিন্তু বিশ্বের কাছে এটা অজ্ঞাত নেই যে পাকিস্তান হল ইসলামিক সন্ত্রাসের 'প্রজনন ক্ষেত্র'। এই হ্যাচারিতেই তৈরি হয়েছে নানা শিরোনামের জঙ্গি সংগঠন। তার মধ্যে এখন পাকিস্তানের গলার দুই বড় কাঁটা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা পাক তালিবান এবং হক্কানি নেটওয়ার্ক। পাক তালিবান এবং হক্কানিরা পাকিস্তানের মধ্যেও সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত। সাম্প্রতিক একটা উদাহরণ হল গত ২ অক্টোবর পাক তালিবানরা পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিনওয়াম এলাকায় পাক নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে ৩ জন পাক সেনা এবং একজন পুলিশকে হত্যা করেছে। আর এটা করা হয়েছে ঠিক তার আগের দিন তালিবানের তরফে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও। সুতরাং পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নিয়াজির ব্যাখ্যায় তারা খারাপ সন্ত্রাসবাদী। আর পাকিস্তান যাদের মদত দিয়ে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে চূড়ান্ত বর্বরতার নজির সৃষ্টি করেছে, নিয়াজির কাছে তারা হল খুব ভালো সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু ঘটনা হল, পাক এবং আফগান, দুই তালিবানই সৃষ্ট এবং পালিত পোষিত হয়েছে পাকিস্তানে। পাক প্রধানমন্ত্রীর কাছে তথাকথিত ভালো তালিবানরা ২০০১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের তাড়া খেয়ে এসে ঘাঁটি গাড়ে পাকিস্তানে এবং পাক মদতেই ফের কাবুল দখলের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। ২০ বছর ধরে তারা মাঝে মাঝে আফগানিস্তানে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তান এবং সম্প্রতি আফগানিস্তানের সীমান্তরেখা যাকে ডুরান্ড লাইন বলা হয়ে থাকে তার দু'পাশের ভূমিপুত্র যাঁদের একাংশকে পাশতুন বা পাখতুন বলা হচ্ছে সেইসব জনজাতির পাক-বিরোধিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথমে পাক সরকারই স্থানীয় জেহাদি মনোভাবাপন্নদের মদত দিয়েছিল। কিন্তু পরে তাদের একাংশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে পাশতুন আন্দোলন বা পাখতুন বিদ্রোহে শামিল হয়। রাষ্ট্রসংঘে মোদী সেদিন যে

সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন তা যেমন ভবিষ্যৎবাণী, এই প্রেক্ষিতে, ঘটনা পরম্পরার নিরিখে তেমনি তা অভিজ্ঞতার নির্যাসও।

চলতি কথায় বলে 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে।' ফ্যাসাদে পড়ে গিয়ে নিয়াজি এখন পাকিস্তানি তালিবান এবং হক্কানি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে good terrorist, bad terrorist কিংবা good বা bad Taliban বলে আলাদা কিছু নেই। দুই তালিবানেরই আসল লক্ষ্য পাকিস্তান দখল করা। কারণ পাকিস্তানের হাতে রয়েছে পরমাণু বোমা। সে প্রক্রিয়া তারা অনেক আগে থেকেই শুরু করেছে। একথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন আই এস আই-এর এক প্রাক্তন প্রধান আসাদ দুরানি। গত ১৮ আগস্ট প্রকাশিত তাঁর এক বক্তব্য অনুসারে, 'কাবুলে মার্কিন সেনাদের আগমনের পরপরই পাকিস্তান লক্ষ্য করে যে আফগানি লড়াকুরা কাতারে কাতারে এসে ডুরাণ্ড লাইনের দুপাশে জমা হচ্ছে। তখন সেই পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছিল (পড়ুন তৈরি করা হয়েছিল) তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামের নতুন জঙ্গি সংগঠন। কিন্তু কিছুদিন কাটতে না কাটতেই তারা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে দাঁড়ায়। সেই নয়া তালিবানরা দু'দুবার পাকিস্তানের স্বাত জেলা দখল করে নেয়। সেইসঙ্গে পাকিস্তানে বারবার জঙ্গি হামলা চালাতে থাকে। আর যতবারই পাকিস্তানে পাকিস্তানেরই হাতে তৈরি হওয়া সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালিয়েছে ততবারই পাক কর্তরা নিজেদের ভুল ঢাকতে 'র' তথা ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছেন এবং প্রত্যেক বারেই প্রমাণ দিতে না পারায় বিশ্ব দরবারে পাকিস্তানকে অপদস্ত হতে হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন, প্রাক্তন আই এস আই প্রধানের বক্তব্য অনুসারে ২০০১ সালের পর বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি পাক তালিবান বা টিটিপি-র জন্ম হয়ে থাকে তাহলে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত যে তালিবানরা আফগানিস্তান দখল করে বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের তৈরি করেছিল কারা এবং তারা গেলই বা কোথায়? পাকিস্তানের কাছে এর কোনো সদুত্তর নেই। উল্টে সংবাদ সংস্থা সি এন এন-কে দেওয়া পাক প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে গত ১৬ সেপ্টেম্বর তাতে তিনি হক্কানিদের ''আফগানিস্তানে 'পাশতুন জনজাতি' বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, ''আফগানিস্তানে 'জেহাদিরা' যখন হামলা চালায় তখন প্রায় ৫০ লক্ষ আফগানি পাকিস্তানে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হক্কানিও ছিল।'' ইমরান নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'পাকিস্তানে সেইসব ত্রাণ শিবিরে জন্ম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা হক্কানি মুজাহিদিনদের।' ইমরানের এই বক্তব্যের সারবত্তা থাকলে এটাই ধরে নিতে হয় যে তালিবান নয়, আফগানিস্থানে বারবাক ফরমানের সরকারকে বাঁচাতে আসা সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল হক্কানিরা। অথচ গোটা বিশ্ব জানে ১৯৯৬ সালে আফগানে শাসন কায়েম করেছিল তালিবানরা। লড়ল হক্কানি আর সরকার চালালো তালিবান? অন্যদিকে দুরানির বক্তব্য অনুসারে নিয়াজি যাদের আফগান শরণার্থী বলছেন তারা বা তাদের বেশিরভাগ হল পাশতুন জনজাতি। তাহলে তালিবান কারা? আসলে পাক সরকার যেনতেন প্রকারে পাশতুন এবং বালোচদের বিরুদ্ধে নানা রকমের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রচার করে যাচ্ছে। কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে পাক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন। পাকিস্তান বালোচদের ওপর কী ধরনের দমনপীড়ন চালিয়েছে তা অন্য এক প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

পাকিস্তানের কোয়েটায় তালিবানী হামলা।

এদিকে হক্কানি-পাশতুন সম্পর্কে ইমরানের বক্তব্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় হাসাহাসি চলছে। পাশাপাশি পাক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পাশতুনদের ক্ষোভের পারদ চড়ছে। ঘটনা হল, আফগানিস্তানে 'হক্কানি' নামে কোনো পাশতুন নেই। কোনো পাশতুন জনজাতি হক্কানি নেটওয়ার্কে কখনো ছিলও না। তালিবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরসহ অধিকাংশ তালিবান নেতা পাঠ নিয়েছে পাকিস্তানে, দার-উল-উলুম হক্কানিয়া নামের এক ইসলামি ধর্মশিক্ষা কেন্দ্রে। এককথায় তাকে মাদ্রাসা বলা যেতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর খাইবার পাখতুনখাওয়ার নওশেরা জেলায় সেই কেন্দ্রের স্থাপনা করেন মৌলনা আবদুল হক্কানি। এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নিহত জালালউদ্দিন হক্কানিও ওই মাদ্রাসার ফসল ছিলেন। আসলে ওই মাদ্রাসায় পাঠ নেওয়া প্রায় সকলেই নিজেদের নামের সঙ্গে 'হক্কানি' শব্দটা জুড়ে নিয়েছে। সেটাকেই তারা বলে 'নেটওয়ার্ক'। সিরাজউদ্দিন হক্কানির মতো অনেক তালিবান নেতাও নিজেদের নামের সঙ্গে হক্কানি শব্দ ব্যবহার করে। হক্কানি নেটওয়ার্কের বর্তমান মাতব্বর সিরাজউদ্দিন হক্কানির পূর্বসুরী জালালউদ্দিনের পরিবার পাকিস্তানে এসেছিল দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান থেকে। আদতে তারা ছিল জর্ডনের সুলতানখেল উপ-জনজাতির লোক। তাদের মূল বাসস্থান হল পাকিস্তান সীমান্তের খুব কাছে জর্ডনের পাকশিয়া প্রদেশের ওয়াজি জর্ডন জেলা। পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের জনজাতি প্রধান এলাকা থেকে জালালউদ্দিনের এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অনেকবারই আফগানিস্তানে ঢুকে রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়েছে। এক সময় পাকিস্তান তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে সেইসব হামলায় উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে এসেছে। পাকিস্তানের এই কুকীর্তির কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত থাকা এক পাক রাষ্ট্রদূতই। তাঁর নাম হোসেন হক্কানি। অতএব দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে একদিন যে হক্কানিদের তৈরি করা হয়েছিল এখন তারাই ভস্মাসুর হয়ে পাকিস্তানের মাথার চুল ওপড়াচ্ছে।

এবারও তালিবানদের আফগানিস্তান দখলে পাকিস্তানের যে প্রত্যক্ষ মদত আছে তার সবচাইতে বড় প্রমাণ মেলে পঞ্চশির দখল করতে যাওয়া তালিবানদের ওপর সেদিন মাঝরাতে কোনো এক দেশের জঙ্গি বিমান থেকে ব্যাপক বোমা বর্ষণে। ওই প্রত্যাঘাতে প্রায় ৩০০

তালিবান নিহত হয়। সেই সঙ্গে ২১ জন পাক সেনারও মৃত্যু ঘটে। পঞ্চশির প্রদেশের সীমান্ত লাগোয়া দেশ হল তাজাকিস্তান। সেখানকার সরকার পঞ্চশিরের তালিবান ও পাকিস্তান বিরোধিতাকে প্রথম থেকেই সমর্থন করে যাচ্ছে। এমনকি সামরিক সাহায্যও দিচ্ছে। তবে তাদের যুদ্ধবিমান থেকে ওই বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতের বাইরে একমাত্র তাজাকিস্তানেই ভারতীয় বায়ুসেনার একটা আউটস্টেশন বা ঘাঁটি রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের কেউ এমনকি পাকিস্তানও ভারতের দিকে আঙুল তোলেনি। ঘটনাটা এখনো গভীর রহস্যাবৃত। বলা বাহুল্য, হামলাকারী বা হানাদারদের সঙ্গে ছদ্মবেশে সেনা পাঠিয়ে অন্যের জমি দখল করাটা পাকিস্তানের জন্মজাত অভ্যাস। ১৯৪৮ সালে জম্মু-কাশ্মীরে এটা করে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখেছে। এককালের পূর্ব পাকিস্তান থেকে একইভাবে তৎকালীন ব্রহ্মদেশের উত্তর আরাকানে রাখাইন প্রদেশ দখল করারও মতলব ছিল প্রয়াত জিন্নার। কিন্তু পাকিস্তান পঞ্চশিরে তা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। সারা বিশ্বের কুনজরে পড়েছে। এই ফাঁকে জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে পাঁচটা উঁচু-উঁচু চূড়াওয়ালা পাহাড়ে ঘেরা আফগানিস্তানের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রদেশ পঞ্চশির বা পঞ্জশির এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত তালিবান জঙ্গিদের কাছে মাথা নত করেনি। শির (মাথা) উঁচিয়ে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও পরাজয় বরণ করেনি। সোভিয়েত বাহিনীর কাছেও না, তালিবানদের কাছেও না। উল্টে এবার পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিয়ে মাথা হেঁট করে দিয়েছে। এখন প্রায় গোটা বিশ্ব তালিবানদের যতবড় বিপদ মনে করছে তার চাইতে বড় সন্ত্রাসী মনে করছে পাকিস্তানকে। গত ২৮ আগস্ট মার্কিন সেনেটাররা আফগানিস্তানে তালিবানী আগ্রাসনের নেপথ্যে পাকিস্তানের ভূমিকার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব পেশ করেছেন।

২০০১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের ভূমিকা কী ছিল তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকার জো বাইডেন সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে তালিবানদের মদত দেবার কারণে আমেরিকা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে কিনা তা বিচার বিবেচনা করবে। পাক প্রধানমন্ত্রী বার বার কাতর অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এখনও পর্যন্ত দেখা করতে চাননি। পেন্টাগন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে যে প্রয়োজনে মার্কিন সেনাবাহিনী ফের আফগানিস্তানে ব্যবস্থা নিতে পারে। এমনকী রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চীন-সহ ভেটো প্রয়োগের অধিকারী প্রধান ৫টা দেশের প্রত্যেকেরই এক বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদের কোনো সূতিকাগারকেই আর রেয়াত করা হবে না। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এফ) থেকেও আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানকে এখনই কোনো অর্থ না দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ৭৬ তম সাধারণ সভার অবসরে জো বাইডেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে যৌথভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার অঙ্গীকার করেছেন। আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস তার আগেই মোদির সাথে দেখা করে জানিয়েছেন যে তিনি পাকিস্তানের কাছে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করেছেন। বিশ্বের ১৮৮ টা দেশ চাইছে পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করা হোক। অন্যদিকে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রাণ ছাড়াও সবচাইতে জরুরি হল প্রচুর অর্থ সাহায্য। এতদিন পাকিস্তান সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের বাহানায় বিপুল পরিমাণে যে অর্থ পেয়ে এসেছে তা দিয়ে তালিবান, হক্কানি ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিপালন করেছে। এখন সেই মূল সাপ্লাই লাইনটাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে কেবল তালিবানি কব্জায় চলে যাওয়া আফগানিস্তানই নয়, গলা শুকিয়ে যাবে খোদ পাকিস্তানেরও। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে গিয়ে মোদী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবাইকে অবহিত করে এসেছেন। যার প্রকৃত অর্থ হল, পাকিস্তানের মতো নিরন্তর মিথ্যেবাদী তথা বস্তুত ত্রাণের টাকায় জঙ্গি উৎপাদন করা রাষ্ট্রকে সবক শেখাতে হলে তাকে ভাতে মারা দরকার। পাক মদতপুষ্ট তালিবানরা এই অধিবেশন চলাকালীনই এই বিশ্বসংস্থার সদস্যপদের দাবি জানিয়েছিল। যাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম সদস্য হিসাবে মোটা অর্থ সাহায্য মেলে। কিন্তু প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেরই বিরোধিতার মুখে পড়ে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ তো দূরের কথা এখনো পর্যন্ত কোনো দেশ তালিবানি আফগানিস্তানকে স্বীকৃতিই দেয়নি। এদিকে পাকিস্তানের পক্ষে আফগানিস্তানের আর্থিক হাল ফেরাতে অর্থ জোগান দেবার মতো কোনো অবস্থাই নেই। পাকিস্তান এখন যদি তা না দিতে পারে তাহলে কেবল মাদক চালানোর টাকায় আফগানিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানো দুরূহ। ফলে আর কিছুদিনের মধ্যে কেবল তালিবানরাই নয়, হক্কানি, লস্কর-সহ সমস্ত জঙ্গি পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খেতে বাকি রাখবে না। কেবল আর্থিক সঙ্কটই নয়, পাকিস্তানের সামনে এখন আরও অনেক তীক্ষ্ণ হুল গজিয়ে উঠছে। তালিবানদের মদত দিয়ে আই এস আই আফগান দখলে আপাতদৃষ্টিতে সফল হয়েছে। কিন্তু তালিবান প্রশাসনে এখন তাদের তুরুপের তাস মোল্লা বরাদরই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ছিটকে গেছেন। কাবুল থেকে পালিয়ে গেছেন কান্দাহারে। শোনা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ঠিক করার বৈঠকে তাঁকে নাকি মারধরও করা হয়েছে। সেখানে আই এস আই-এর সব চাল ভেস্তে গেছে। এবার সেই বরাদরই পাকিস্তানের মাথাব্যাথার কারণ হতে পারে। আফগানিস্তানে আই এস আই-এর প্রভাব খর্ব করতে মাঠে নামতে পারেন প্রধানমন্ত্রী না হতে পারা এই জঙ্গিনেতা। তালিবানের আর এক গোষ্ঠীর নেতা আবদুল কায়ুম জাকির। লোকটা পশ্চিম আফগানে জঙ্গি সন্ত্রাস চালিয়ে থাকে। তাকে বিপুলভাবে সমর্থন করে ইরান। গত ৭ অক্টোবর, শুক্রবার আফগানিস্তানের উত্তর কান্দুজ প্রদেশে এবং তার পরের শুক্রবার কান্দাহারে বিবি ফতিমা মসজিদে ফের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোট অন্তত ১৫০ জনেরও বেশি নমাজিকে হত্যা করার ঘটনায় শিয়াপ্রধান রাষ্ট্র ইরান যে জাকিরকে আরও বেশি মদত দেবে তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইরান আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে পঞ্চশির দখলের জন্য পাকিস্তানের মদতকে তারা একেবারেই ভাল

তালিবান নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

চোখে দেখছে না। পাকিস্তানের মদতে তালিবানদের কাবুল দখল করাকে তারা কোনোভাবেই সমর্থন করে না। অন্য আর এক তালিবান গোষ্ঠীর নেতার নাম মোল্লা ইয়াকুব। নিহত মোল্লা ওমরের ছেলে এই সন্ত্রাসবাদী নেতা কান্দাহারি গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে পরিচিত। ২০১৫ সালে ওমরের মৃত্যুর পরে ইয়াকুবেরই তালিবান নেতা হবার কথা ছিল। কিন্তু আই এস আই তখন তা হতে দেয়নি। এখন এই ডামাডোলে এই কান্দাহারি নেতাও পাকিস্তানের গলার কাঁটা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে মাথাচাড়া দিতে পারে মোল্লা জাকির এবং মোল্লা ইয়াকুবের মতো প্রভাবশালী আরও দুই পাক-বিরোধী জঙ্গিনেতা মোল্লা ইব্রাহিম সদর এবং কারি বারিয়াল। কারণ, আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময় পাক গোয়েন্দা কর্তারা তাদের দুজনকে সরকার থেকে বাইরে রেখেছেন। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে এখানে যা যা বলা হচ্ছে তা মুখ্যত আফগানিস্তান লাগোয়া তথা পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক। পূর্ব অংশের সমস্যাও কিছু কম নয়। পশ্চিমে উল্লেখিত এসবের চাইতেও বড় সমস্যা হল খাইবার পাশতুনখাওয়া এবং বালুচিস্তান।

আফগান, তালিবান এবং পঞ্চশিরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান যখন লেজে-গোবরে তখন মোক্ষম আঘাত হানতে তৈরি হচ্ছে পাশতুন এবং বালোচরা। এবার ফের তা বিদ্রোহের চেহারা নিতে পারে। পাক নেতারা যদি বিভিন্ন গোষ্ঠীর তালিবান এবং হক্কানিদের চাপের মুখে পড়েন তাহলে তার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান থেকে আলাদা হবার যে আন্দোলন পাশতুন এবং বালোচরা চালিয়ে আসছেন তা তীব্র হয়ে উঠতে পারে। এদিকে পূর্ব এলাকায় পাক বিরোধী আন্দোলন আরও সংগঠিত হতে পারে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। দক্ষিণ-পূর্ব সিন্ধু প্রদেশেও পৃথক হতে চাইছে। সেক্ষেত্রে একই সঙ্গে সবদিকের মোকাবিলা করাটা পাকিস্তানের পক্ষে দুরূহ হতে পারে।

১৯৭১ সালে আলাদা হওয়া বাংলাদেশের মতো পাশতুনখাওয়া এবং বালুচিস্তান যদি পাকিস্তানের হাত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানের পক্ষে আফগানিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় যেমন অবিভক্ত পাঞ্জাব এবং বাংলার মধ্যে পাকিস্তানের স্বার্থবাহী ম্যাকমোহন লাইন টানা হয়েছে বলে বিস্তর অভিযোগ এবং ক্ষোভ রয়েছে পাশতুনদের মধ্যে। পাশাপাশি বালোচরা বরাবরই ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবিসংবাদী নেতা প্রয়াত খান আবদুল গফফর খান যিনি সবার কাছে 'সীমান্ত গান্ধী' নামে খ্যাত তিনি এবং তাঁর ছেলে খান ওয়ালি খানও পাক-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। কিন্তু ভারত ভাগ যখন ঠেকানো গেল না তখন থেকেই বালোচরা স্বাধীন থাকার পক্ষে। কোনোদিনই তাঁরা পাকিস্তানের নের্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এখনো নয়।

ডুরান্ড লাইন বস্তুত খাইবার এলাকাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। যার পূর্বভাগ পড়েছে পাকিস্তানে আর পশ্চিমভাগ আফগানিস্তানে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিকট সীমান্ত সমস্যা। বিশেষ করে খাইবার পাশতুনখাওয়া এবং পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালুচিস্তানের মধ্যে এই সমস্যা রীতিমতো বিকট। খাইবারের একাংশে আবার দারুণ প্রভাবশালী হল কুর্দিশ বা কুর্দ জনজাতি। কুর্দ জঙ্গিরাও ঘোরতর পাক বিরোধী এবং তারা ভালরকম সশস্ত্র। পাক সরকার ইতিমধ্যেই কুর্দ, বালোচ লিবারেশন আর্মিসহ একাধিক বালোচ মুক্তি সংগ্রামী সংস্থা এবং পাশতুন তাইকুজ মুভমেন্ট বিক্ষোভে নাস্তানবুদ। তার ওপর তেহরিক-ই-তালিবানের পুনরুত্থানে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চুরমার হবার পথে।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে মোল্লা নূর ওয়ানি মাসুদের নেতৃত্বাধীন পাক তালিবান গোষ্ঠী। তেহরিক-ই- তালিবান পাকিস্তান-এর এই গোষ্ঠী আবার বাগদাদির (খোরসান বা কে)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা জঙ্গিদের প্রায় সবাইকে নিজেদের তালিবান গোষ্ঠীতে ঢুকিয়ে নিয়েছে। পাক তালিবানদের এই নূরওয়ালি গোষ্ঠী গত এপ্রিলে কোয়েট্টায় পাকিস্তানে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলা চালিয়েছিল। এরাই গত ১২ সেপ্টেম্বর কোয়েট্টায় ৪ জন পাক সীমান্তরক্ষীকে হত্যা এবং অন্তত ২০ জনকে আহত করেছে। আরও একটা ঘটনা হল আফগানিস্তান দখল করার পর সেখানকার জেলগুলো থেকে শয়ে শয়ে যে বন্দিদের মুক্ত করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগই হল টিটিপি জঙ্গি। জেল থেকে বাইরে এসেই মৌলবি ফকির মহম্মদের মতো কুখ্যাত জঙ্গিনেতা সমস্ত মুজাহিদিনদের একজোট হয়ে আফগানিস্তানে 'ইসলামি আমীরশাহী'র মতো পাকিস্তানেও আমীরশাহী প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছে। এতে তেহরিক-ই-ইনসাফ পার্টির নেতা তথা পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান-সহ পাক কর্তাদের থরহরিকম্প অবস্থা। জঙ্গিদের মদত দিতে গিয়ে ইমরানের নেতৃত্বাধীন পাক সরকারের অবস্থা এখন শাঁখের করাতে আটকে যাওয়ার মতো। না পারছে ফেলতে, না পারছে গিলতে। দিন যত গড়াবে ভস্মাসুর জঙ্গিদের হাত ততই চেপে ধরবে পাকিস্তানের গলা।

চতুর মোরগ

অনেককাল আগে এক জঙ্গলে গোপী নামে এক শেয়াল থাকত। গোপী চালাকির দ্বারা বনের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। প্রথমে বন্ধুত্ব করে তাকে কাছে ডাকে তারপর তাকে ওর ভোজন বানায়। একদিন এক খরগোশকে ডেকে গোপী বলল, খরগোশ ভাই তোমার সাদা ধবধবে গা। আমার তো ওই বিচ্ছিরি চেহারা, যদি তোমার মতো সুন্দর হতাম তবে জীবনটা আমার স্বার্থক হতো। খরগোশ বলল, আহা শেয়াল বোন তুমি দুঃখ করো না। আমায় বলো আর কী কী করলে তোমার জীবন স্বার্থক হবে। খরগোশটা ছিল মহা বোকা। অচেনা শেয়ালের কথার মারপ্যাঁচ খরগোশ বুঝতেই পারল না। শেয়াল তার সুযোগ নিয়ে খরগোশকে বলল, 'তোমার ওই সাদা ধবধবে নরম চামড়ায় যদি একবার হাত বুলোতে পারতাম তবে এ জীবন আমার স্বার্থক হয়। খরগোশ লাফিয়ে লাফিয়ে যেই না শেয়ালের সামনে এল, অমনি গোপী খপ করে খরগোশকে ধরে খেয়ে নিল। এই ভাবেই ধূর্ত শেয়াল বনের পশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের শিকার করতো। জঙ্গলের সকল পশুপাখি শেয়ালের থেকে দূরে থাকতে শুরু করল। ক্রমেই গোপী হয়ে পড়ল একা। এমন শিকার খুঁজতে অনেক কষ্ট করতে হয়। সারাদিন পেরিয়ে যায় একটাও শিকার পায় না।

একদিন মনের দুঃখে গোপী বনের পথে হাঁটছে হঠাৎ দেখতে পেল একটা মোরগ গাছের ডালে বসে আছে। শেয়াল মাথায় বুদ্ধি আঁটছে, কীভাবে

মোরগটাকে গাছ থেকে নামানো যায়। মোরগ দূর থেকে শেয়ালকে আসতে দেখেই তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। গোপী একটা গল্প ফাঁদলো। গোপী মোরগকে বলল, মোরগভাই কিছুক্ষণ আগেই ভগবানের ঘর থেকে নির্দেশ এসেছে যে জঙ্গলের সকল পশুপাখি এবার থেকে মিলেমিশে থাকবে। কেউ কাউকে মারবে না। তুমি গাছের ওপর থেকে নেমে আসো। আমরা একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবো। মোরগ তো খুবই ভয় পেয়ে গেল কিন্তু সাহস হারালো না। গাছের ডালেই বসে রইলো আর ভাবতে থাকলো কী করে শেয়ালকে এখান থেকে সরানো যায়। গোপী আবার বলে চললো, কী মোরগভাই তুমি এখনো গাছ থেকে নামছো না। ভগবানের আদেশ অমান্য করছো।

এবার মোরগের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মোরগ শেয়ালকে বললো, আমি এই গাছের ডালে বসে উঁচু থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো শিকারী কুকুর এদিকেই আসছে। ওরাও বোধহয় ভগবানের নির্দেশ জানতে পেরেছে। তাই আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। এই কথা শুনে গোপী তো সাঙ্ঘাতিক ভয় পেল। হিংস্র শিকারী কুকুর যদি একবার তাকে ধরে নিয়ে যায় আর রক্ষা নেই। গোপী মোরগকে বললো, শিকারী কুকুররা ভগবানের নির্দেশ জানলো কীভাবে? আমি তো কাউকে বলিনি। যেই না একথা বলা অমনি মোরগ বলল, তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করো তাই সব পশুপাখিদের ভাবো বোকা। সবাই তোমার ফাঁদে পড়ে যায়। এখন শিকারী কুকুরের দল আসছে, তোমার চালাকি দিয়ে নিজে বেঁচে দেখাও দেখি। গোপী বাবাগো মাগো বলে উলটোদিকে ছুট মারলো। মোরগ মনে মনে হাসলো আর বললো, যাক্ এ যাত্রায় আমার বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেলাম।

গল্পটা পড়ে তোমরা কী শিখলে বন্ধুরা। এই গল্প আমাদের এই শিক্ষা দিল যে 'অপরিচিত ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করতে নেই, সবসময় বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হয়।'

অনামিকা দে

ভারতের বিপ্লবী

তারকেশ্বর দস্তিদার

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম সৈনিক বীর তারকেশ্বর দস্তিদার। স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু খণ্ডযুদ্ধে বীর তারকেশ্বর মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে সঙ্গীরূপে কাজ করেছেন এবং তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন। ১৯০৯ সালে চট্টগ্রামে বৈদ্য পরিবারে তারকেশ্বরের জন্ম। ছোটোবেলা থেকে তিনি ছিলেন অসীম সাহসী এবং বীর যোদ্ধা। সংগ্রামী মাস্টারদার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা অ্যারেস্ট হন। ১৯৩৪-এ চট্টগ্রাম জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

জানো কী?

- ১২ জানুয়ারি 'ন্যাশনাল ইয়ুথ ডে' হিসাবে পালিত হয়।
- ৪ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যানসার ডে' হিসেবে পালিত হয়।
- ২২ মার্চ 'ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে' পালিত হয়।
- ১০ এপ্রিল 'ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি ডে' পালিত হয়।
- ১ মে 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার ডে' পালিত হয়।
- ৫ জুন 'ওয়ার্ল্ড এনভায়ার্নমেন্ট ডে' পালিত হয়।

ভালো কথা

নতুন অতিথি কুট্টুস

হঠাৎ একদিন খেলার সময় দেখি একটা বাচ্চা কুকুর আমাদের উঠোনে এসে উপস্থিত। আমি তার কাছে যাওয়ায় সে আমার পা-টাকে আকড়ে ধরল। কেমন যেন অসহায়ের মতো। তাকে এরকম অবস্থায় দেখে আমার খুব মায়া হলো। তাকে আমি আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। একটা জুতোর বক্সে আমি কুকুরটার জন্যে বিছানা বানালাম। ওকে ওখানে শুইয়ে দিয়ে আমার জমানো টাকা নিয়ে গিয়ে দোকান থেকে দুধ আনলাম। সেটাকে গরম করে একটা থালায় ঢেলে ওকে খেতে দিলাম। ওর খাওয়া দেখে মনে হলো ওর খুব খিদে পেয়েছিল। দুধটা খেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। দেখে ভাবলাম হয়তো খুব ক্লান্ত। কিছুক্ষণ পরে ও নিজে থেকে উঠে পড়ল, যেন আমার সঙ্গে খেলতে চায়। আমিও খুব আনন্দিত হয়ে ওকে ছাদে নিয়ে গেলাম, সেখানে গিয়ে ও কেমন চুপ হয়ে গেল। ওর কাছে ওটা যেন এক আলাদাই জগৎ। আমরা দুজনেই ওখানে অনেক আনন্দ করলাম। আর এরকম ভাবেই ওকে দেখাশোনা করলাম। ওর নাম দিয়েছি কুট্টুস। এখন ও অনেকটাই বড়ো হয়ে গেছে।

অগ্নিদীপ্ত দে, অষ্টম শ্রেণী, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) অ ত জ্ঞা রি প য়	(১) হ নি স্ত র্মি ত
(২) নি প শি ন প	(২) ত মৃ স ব ঞ্জী নী

৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) জনকল্যাণ (২) উত্তরায়ণ

৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) সহানুভূতিহীন (২) সর্বসম্মতিক্রমে

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, সেকেন্দারপুর, অমৃতি, মালদা। (২) উদিত সরকার, হিলি, দক্ষিণপাড়া, দ: দি: (৩) তমাল সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

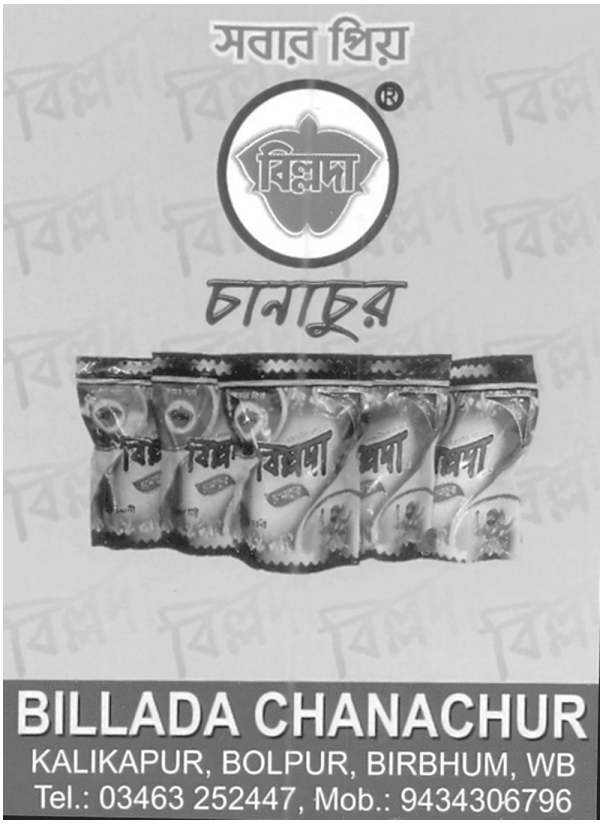

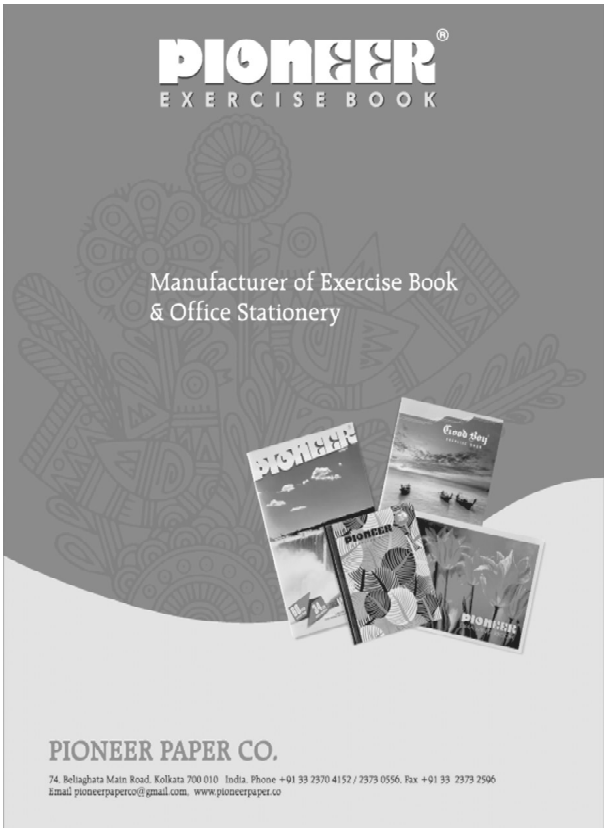

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাংলাদেশের হিন্দু গণহত্যায় হাসিনা সরকারের ভূমিকা সন্দেহজনক

বাংলাদেশে প্রতি বছরই নানা অছিলায় ঘটানো হয় দাঙ্গা। কখনও গ্রামে, গঞ্জে বা পাড়ায়, কখনওবা সারাদেশে। প্রকাশ্যে বা গোপনে। চলে ইসলামের রীতি মেনে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ। কিন্তু 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

ধীরেন দেবনাথ

বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে প্রসব হলো অশ্বডিম্ব। অর্থাৎ বাংলাদেশের কুমিল্লার এক পুজোমণ্ডপে কোরান রাখা ব্যক্তিকে শনাক্ত করা গেছে। নামও গেছে জানা। ইকবাল হোসেন। কুমিল্লার এসপি জানিয়েছেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ইকবালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জানা গেছে ঠিকানাও। কুমিল্লার সুজানগর। কিন্তু ইকবালকে কি ধরা যায়? সে পলাতক।

তবে খবরে প্রকাশ, গত ১৩ অক্টোবর বুধবার, দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিন ভোরবেলা কুমিল্লার জেলা শহরের (নানুয়াদিঘি) একটি পুজোমণ্ডপে পাওয়া গেছে একটি কোরান। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, 'চিহ্নিত লোকটি কুমিল্লা মাজার সংলগ্ন একটি প্রসিদ্ধ মসজিদে রাত ৩টার দিকে কয়েকবার গিয়েছিল। মসজিদের খাদেমের সঙ্গে কথা বলে সে মসজিদ থেকে কোরান শরিফ এনে মূর্তির কোলে রেখে মূর্তির গদাটি কাঁধে করে নিয়ে এসেছে।' অর্থাৎ মূর্তিটি যে গদাধারী হনুমানের ছিল তাতে নেই সন্দেহ। অবশ্য অনেকের বক্তব্য, কোরানটি ছিল হনুমানের পায়ের কাছে। এক শ্রেণীর জেহাদি প্রশ্ন তুলেছে, 'দুর্গামণ্ডপে কেন হনুমানের মূর্তি?' একে মূর্খের প্রশ্ন ছাড়া কী বলা যায়? কারণ দুর্গামণ্ডপে কার কার মূর্তি থাকবে তা কি তাদের মতানুসারে হবে? আসলে ইকবালের হাতে গদাটি ছিল। যার ফলে তাকে সহজেই শনাক্ত করা গেছে। প্রশ্নকারীরা চাইছিল না ইকবাল ধরা পড়ুক। কিন্তু গদার জন্যই সে সহজে ধরা পড়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে পুলিশের বক্তব্য, 'সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সপ্তমীর রাতে স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে এক ব্যক্তি হাতে কোরান নিয়ে বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তাকে দেখা যায় নানুয়াদিঘির পাড়ে। কিন্তু তখন তার হাতে কোরান ছিল না। ছিল হনুমানের গদা। রীতিমতো অশান্তি বাঁধানোর উদ্দেশ্য নিয়েই দেবতার পায়ের কাছে পবিত্র কোরান রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাই ঘটনাটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সুপরিকল্পিত।' অবশ্য কক্সবাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ফঃ ৬

তবে এই ঘটনা কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেমন—

(১) অপরাধীকে শনাক্ত করতে প্রায় দিন দশেক লেগে গেল কেন?

(২) সঙ্গে সঙ্গে কেন দেখা হলো না সিসিটিভি ফুটেজ?

(৩) গোয়েন্দা বিভাগ 'সুপরিকল্পিত' ওই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর আগেভাগেই জানতে পারল না কেন? এটা কি গোয়েন্দা ব্যর্থতা নয়? আর যদি জেনেও থাকে তাহলে তা সরকারকে জানানো হয়েছিল কী? যদি সরকারকে জানানো হয়ে থাকে তাহলে দাঙ্গা বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কেন? কেন আর্মি নামানো হয়নি? না কি গোয়েন্দা রিপোর্ট সঠিক ছিল না বা প্রকৃত রিপোর্ট চেপে গিয়ে দাঙ্গা ঘটাতে সাহায্য করেছে গোয়েন্দা বিভাগ? যদি তাই হয়, তবে তো 'সর্ষের মধ্যেই ভূত'।

(৪) দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ অত হিমশিম খেল কেন? কেন লেগে গেল দীর্ঘদিন? এটাও কি পুলিশের ব্যর্থতা নয়? নাকি উপরের নির্দেশ ছিল 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' ভূমিকা নেওয়ার?

(৫) বহু দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় দেখা গেছে, পুলিশ নিষ্ক্রিয় বা নীরব দর্শক। কোথাও পুলিশ দাঙ্গাবাজদের ভয়ে পিছু হটেছে বা পালিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? তবে কি 'নিধিরাম সর্দার' পুলিশ সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের দাঙ্গা, হত্যালীলা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ঘটাতে সাহায্য করেছে? নাকি আত্মরক্ষার্থে এহেন সিদ্ধান্ত? এক্ষেত্রেও কি ছিল পুলিশমন্ত্রী বা পুলিশের বড়কর্তার 'ধীরে চলো' নীতির নির্দেশ? না অন্য ধান্দা?

(৬) বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনাকে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ অনেক নেতা-মন্ত্রী বলেছেন, 'পূর্বপরিকল্পিত'। আর এ কথাটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। তাই প্রশ্ন, পূর্বপরিকল্পিত দাঙ্গা বন্ধে সরকার কী করছে? কেন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হচ্ছে? কেন পরিকল্পনাকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না? কেন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পূর্বপরিকল্পনার সাফাই গাওয়া হচ্ছে? তবে কি সরকারই দাঙ্গার সুযোগ দিচ্ছে?

(৭) বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ যদি হয়ে থাকে পুজোমণ্ডপে ইকবালের রাখা একটি কোরান, তাহলে রংপুরের পিরগঞ্জের হিন্দুপল্লীতে দাঙ্গা ও অগ্নিসংযোগের মূল পাণ্ডা শওকত। সে কুমিল্লার ঘটনার পর তার ফেসবুকে নানা উস্কানিমূলক খবর পোস্ট করেছিল। এমনকী, সে নানা গুজব ও অপপ্রচার চালিয়ে এবং মিথ্যে পোস্টের মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে স্থানীয় লোকদের উত্তেজিত করেছিল। যার পরিণতিতে ওই পল্লীতে ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার নেতৃত্বে ছিল শওকত। এই ঘটনাও নাকি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, শওকতের প্ররোচনামূলক পোস্টগুলি কি র‍্যাপিড্ অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের নজরে পড়েনি? নাকি হিন্দুদের সর্বনাশ করতে ও দাঙ্গাবাজদের দাঙ্গা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে?

(৮) ইকবালকে পালাতে সাহায্য করেছে কারা?

(৯) ইকবালের পরিবারের বক্তব্য, ইকবাল নাকি নেশাগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন, বখাটে, পাগল, মাদকাসক্ত, মাতাল ইত্যাদি। কিন্তু সে নিয়মিত নামাজ পড়ে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তার দুটো বিয়ে, দুটো সন্তান। তাই প্রশ্ন, এমন একটা পাগল, মাতাল ও মানসিক ভারসাম্য হারানো মানুষ নিয়মিত নামাজ পড়ে কী করে? এমন একটা লোকের সঙ্গে কেউ জেনেশুনে মেয়ের বিয়ে দেয়? একটা মাতাল, পাগল ও মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ পুজোমণ্ডপে ঢুকে মূর্তির পায়ের কাছে কোরান রেখে গদা নিয়ে ফিরে এসেছে— কোনো ভাঙচুর চালায়নি। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? নাকি 'ডলমে কুঁছ কালা হ্যায়'? ওকে মাতাল, পাগল, মানসিক ভারসাম্যহীন সাজিয়ে অপরাধ লঘু বা বেকসুর খালাস করার ষড়যন্ত্র করছে না তো পুলিশ-প্রশাসন? দাঙ্গার মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে না তো?

(১০) মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনকালে স্বাধীনতার শত্রু রাজাকার, আলবদর, জামাত এবং হালের ইসলামিক জঙ্গি, জেহাদি ও নব্য তালিবানদের এত বাড়-বৃদ্ধি কেন? কেন তাদের নির্মূল করা হচ্ছে না?

(১১) ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম কেন আজও ইসলাম?

(১২) বাংলাদেশ সৃষ্টির পরেও হিন্দুর সংখ্যা কমে কমে কেন আজ প্রায় ৮ শতাংশে এসে পৌঁছেছে? কেন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে? কেন তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে? হীনমন্যতায় ভোগা হিন্দুরা কেন বাংলাদেশকে বসবাসের পক্ষে বিপজ্জনক ভাবছে? এর উত্তর কী?

(১৩) বাংলাদশেকে 'হিন্দুশূন্য' করার সুদীর্ঘ চক্রান্তের শেষ হবে কী?

(১৪) 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' আজও চালু হয়নি। আর কবে চালু হবে?

(১৫) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই বলেন, 'অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ'-এর কথা। এটা কথার কথা নয় কী? কারণ যে দেশের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম', সে দেশ অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ হয় কী করে?

(১৬) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, নেতা, মন্ত্রীরা কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটার পর বলে থাকেন 'বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই হামলা'। কুমিল্লাকাণ্ড এবং সাম্প্রদায়িক হামলা-দাঙ্গার পরেও তাঁরা সেই একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ 'সব শেয়ালের এক রা'! তাই প্রশ্ন, বাংলাদেশের 'ভাবমূর্তি' বলে সত্যিই কিছু আছে কী? যে দেশে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটছে হিন্দু নির্যাতন, হত্যা, অসম্মান, নারী ধর্ষণ, অপহরণ, ঘরবাড়ি লুণ্ঠন, গৃহদাহ, বলপ্রয়োগ ও ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ, কথার অমিল হলেই মালাউন, কাফের, ভারতের দালাল বলে গালি দেওয়া, হিন্দু সম্পত্তি জবরদখল করা এবং অধিকাংশ মুসলমান পাকসমর্থক ও ভারত বিদ্বেষী, অথচ ভারতের সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি ছাড়া একদিনও চলে না— সেই দেশের আবার ভাবমূর্তি? যে ভারতের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, সেই ভারতকে বাংলাদেশ সন্দেহের চোখে দেখে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দুরাও করেছে মুক্তিযুদ্ধ। তারাও রক্ত ঝরিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে। পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর তথা স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে খুন হয়েছে কয়েক লক্ষ হিন্দু। অসংখ্য নারী খুইয়েছে ইজ্জত। লুণ্ঠিত হয়েছে হিন্দুদের সম্পত্তি, ঘরবাড়ি। ভস্মীভূত হয়েছে বহু বাড়ি। লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। সেই ভূমিপুত্র হিন্দুরা বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ দশক পাক-শাসনকালে নির্যাতিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও অপশাসনের শিকার। তারা পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। পশুর চেয়েও অধম। এহেন ইসলামিক বাংলাদেশের নেতা-মন্ত্রীদের কালিমালিপ্ত মুখে 'বাংলাদেশের ভাবমূর্তি' কথাটা উচ্চারণ কতটা যুক্তিযুক্ত? কতটা মানানসই? যেখানে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী এবং পুলিশ- প্রশাসনের মধ্যেই রয়েছে

পাকপন্থী, হিন্দু বিদ্বেষী ও ভারত বিরোধীরা, যাদের সঙ্গে রয়েছে দাঙ্গাবাজদের গভীর সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব!

(১৭) শেখ হাসিনা সরকারের জনপ্রিয়তা প্রায় তলানিতে। ২৩ সালে বাংলাদেশে নির্বাচন। সংখ্যালঘু ভোট (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান) প্রায় ১১ শতাংশ। শাসকদল আওয়ামী লিগের মুসলমান ভোট ২০-২৫ শতাংশ। দাঙ্গার শিকার সংখ্যালঘুরা ভোট বয়কট করতে পারে। যদি তা না হয় তবে শাসক দল পেতে পারে সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ ভোট। বিরোধীরা পাবে ৬৪ শতাংশ ভোট। আর এটা শাসকদলের কাছে অশনি সংকেত। বাংলাদেশে স্বাধীনতার শত্রু খালেদা জিয়ার বিএনপি, জামাত, জেহাদি, তালিবান তথা ভারত ও হিন্দু-বৌদ্ধ (কাফের) বিরোধী পাকিস্তান-তালিবানপন্থী উগ্র জঙ্গি মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরাই বিশাল বিশাল মিছিল থেকে হুঙ্কার ছেড়েছে— 'আমরা সবাই তালিবান— বাংলা হবে আফগান।' অর্থাৎ এরা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায়। আর এটাই এখন শাসকদলের কাছে শিরঃপীড়ার কারণ। ক্ষমতা হারানোর আতঙ্ক। তাই শাসকদল তার ক্ষমতা ধরে রাখতেই কী অবশেষে হিন্দু বিদ্বেষী, ভারত বিরোধী কট্টর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ জেহাদি- তালিবানপন্থীদের তুষ্ট করে সমর্থন আদায়ে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্গাষ্টমীর দিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করেছে? অসম্ভব কিছু নয়। কারণ ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে রাজনীতিতে শত্রুকে মিত্র করে নেওয়ার রীতি আছে। আর তাইতো, রাজনীতি এক জটিল অঙ্ক।

দাঙ্গাবাজ জামাত, জেহাদি, তালিবানপন্থীদের তোল্লা দিলে হাসিনার পরিণতিও হবে তাঁর পিতা মুজিবেরই মত। কারণ 'পাপ ছাড়ে না বাপকেও।'

(১৮) সংখ্যালঘু নিধন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধে হাসিনা সরকার ব্যর্থ নয় কী?

(১৯) বাংলাদেশ কি পাকিস্তান বা তালিবানিস্তান হয়ে যাচ্ছে না?

(২০) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপ্রবণ বাংলাদেশকে 'ব্ল্যাক্‌লিস্টেড্' করা উচিত নয় কি?

এতসব প্রশ্নের পরেও থেকে যায় অনেক কথা, যা প্রকাশ না করলে অজানা থেকে যাবে সেসব কথা। তাই সেসব কথা জানাতে প্রয়াসী হচ্ছি।

পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর জনক ছিলেন অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লিগনেতা হোসেন শহিদ সুরাবর্দি। যার নির্দেশ, অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট, রমজান মাসের শেষ রাতে, শুক্রবার, কলকাতায় সফল করা হয়েছিল কুখ্যাত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (ডাইরেক্ট অ্যাকশন)। আর সেই বীভৎস 'কাফের' তথা হিন্দু গণহত্যা কাণ্ডে ১৫০০০- এরও বেশি হিন্দু হয়েছে নিহত। আহতের সংখ্যা এর থেকেও বেশি। ধর্ষিতা হয়েছে অসংখ্য হিন্দু নারী। অগ্নিদগ্ধ হয়েছে অগণিত হিন্দু বাড়ি। লুণ্ঠিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা ও ধনসম্পদ, সোনাদানা, রত্নরাজি। তিনদিন ধরে রাস্তায় চলেছে লাশ নিয়ে শকুন-কুকুরে টানাটানি। আর এ 'জেহাদ' (ধর্মযুদ্ধ) হয়েছে নাকি কোরানের নির্দেশ মেনে। চমৎকার!

অতঃপর ওই বছরেরই ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন সুরাবর্দীর চেলা ও মুসলিম লিগের পাণ্ডা কুখ্যাত দাঙ্গাবাজ গোলাম সরোয়ার নোয়াখালিতে এক পৈশাচিক হিন্দু নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে। জেহাদি দাঙ্গাবাজরা পাকিস্তান হাসিল করতে সশস্ত্র হয়ে 'নারায়ে তক্‌বীর, আল্লাহু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দু বাড়িতে। তারা হত্যা করে সপরিবারে জমিদার, ধনী ব্যবসায়ী, উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক, জোতদার, হিন্দু মহাসভার নেতা এবং সাধু-সন্ত ও ধর্মগুরুদের। হতাহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। বহু নারী হয় ধর্ষিতা, অপহৃতা। হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত হতে করে বাধ্য। আর এহেন ঘটনাও ঘটানো হয়েছে পবিত্র কোরানের নির্দেশ মেনে। হায় কোরান! হায় ইসলাম!

আর এহেন একনিষ্ঠ ইসলামের বান্দা, জেহাদি, শিক্ষিত, পরধর্ম অসহিষ্ণু ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্মদাতা সুরাবর্দীর ছিলেন আরও এক ভাবশিষ্য। শেখ মুজিবুর রহমান— যিনি বাংলাদেশের জনক। তিনি ছিলেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র এবং মুসলিম ছাত্র-লিগের সভাপতি। এটি ছিল মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠন। অর্থাৎ মুজিবও ছিলেন সুরাবর্দী, গোলাম সরোয়ারের মতো জেহাদি, পাকিস্তানের দাবিদার এবং হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু রাজনৈতিক গুরু সুরাবর্দির সৃষ্ট পূর্বপাকিস্তানের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধে সুড়সুড়ি দিয়ে গঠন করেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল— আওয়ামি লিগ। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামি লিগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে করে জয়লাভ। এই জয় ছিল মূলত পূর্বপাকিস্তানে।

কিন্তু বাঙ্গালি বিদ্বেষী পাক সামরিক শাসক জে: ইয়াহিয়াখান মুজিবকে সরকার গঠনে না ডেকে কালক্ষেপ পূর্বক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকেন। মুজিব ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দান থেকে এক বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এরপর '৭৯-এর ২৫ মার্চ সশস্ত্র পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার জনগণের উপর। চলে হত্যালীলা। গণধর্ষণ। লুণ্ঠন। অগ্নিসংযোগ। পরে সেই গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ছড়িয়ে পড়ে সারা বাঙ্গলায়। প্রায় এক কোটি হিন্দু আশ্রয় নেয় ভারতে। পূর্বপাকিস্তানে চলে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায়। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধজয়ী দুই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে: জে: জগজিৎ

সিং অরোরার কাছে। বাংলাদেশ হয় স্বাধীন। পাক কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত হয়ে ঢাকা যাবার পথে দিল্লিতে অবস্থানকালে ভারতকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠবন্ধু বলে ঘোষণা করেন (১০.১.৭২)।

১৯ মার্চ মার্চ '৭২ ভারতের সঙ্গে করেন ২৫ বছরের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি। এর কিছুদিন পরেই মুজিব সরকার সাবেক পাকিস্তানের করা 'শত্রু সম্পত্তি আইন'টি বহাল রেখে হিন্দুদের উপর হানে প্রথম আঘাত। এরপর সৌদি আরবের নির্দেশ ও চাপে মুজিব পাকযুদ্ধ- বন্দিদের মুক্তি দিতে সম্মত হন। সৌদি বাদশা বলেন, 'পাকিস্তান আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু।' অগত্যা বাদশা ও ইসলামিক দুনিয়ার কথা ভেবে তিনি ইসলাম ও সৌদির কাছে করেন আত্মসমর্পণ। আরব দুনিয়াকে তুষ্ট করতে তিনি বলেন, 'আরবরা আমাদের ভাই।' তিনি যুদ্ধাপরাধীদের করেন বিনা বিচারে সাধারণ ক্ষমা এবং ৯৩ হাজার পাকসেনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ আমে-দুধে মিশে যায়। দেশ, জাতি, ৩০ লক্ষ শহিদ, লক্ষাধিক ধর্ষিতা নারী, এক নদী রক্ত ও স্বাধীনতার প্রতি এর চেয়ে বড়ো বেইমানি আর কী হতে পারে? সৃষ্টিকর্তাও বেইমানদের চরম শাস্তি দেন। পাকপন্থী হিন্দু-বিদ্বেষী সুরাবর্দীর ভাবশিষ্য শেখ মুজিব হিন্দুদের প্রতি চরমতম অবিচার করেন। তিনি বাংলাদেশকে সোভিয়েত রাশিয়ার ধাঁচে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ বা 'বাকশাল') গড়ে তুলতে গেলে কমিউনিস্ট বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান, সৌদি আরব-সহ কিছু দেশ ও বাংলাদেশের পাকপন্থী সেনাকর্তা ও রাজনীতিকদের যৌথ ষড়যন্ত্রে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে খুন হন শেখ মুজিব। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান দুই মেয়ে হাসিনা ও রেহানা। তখন হাসিনা ছিলেন বিজ্ঞানী স্বামীর সঙ্গে দিল্লিতে এবং রেহানা ছিলেন জার্মানিতে। শোনা যায়, শেখ সাহেবের এককালের রাজনৈতিক বন্ধু ও অস্থায়ী বাংলাদেশের সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদও ছিলেন সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। ষড়যন্ত্রকারীরা মোস্তাককে ক্ষমতায় বসায়। উগ্র সাম্প্রদায়িক ও খুনি মোস্তাক সরকারকে তখনই স্বীকৃতি দেয় চীন ও পাকিস্তান। স্বীকৃতি দেয় সৌদি আরব-সহ কিছু মুসলমান দেশ। এরপর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আওয়ামি লিগের চার নামজাদা নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলি ও কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। সম্পূর্ণ হয় ষড়যন্ত্রের বৃত্ত।

অতঃপর মোস্তাকের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করেন সেনাপ্রধান জে: জিয়াউর রহমান। তাঁর কুখ্যাত কুকীর্তি 'রাজাকার পুনর্বাসন' চালু এবং সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে ছেটে ফেলা। সেটা ১৯৭৭ সাল। '৮২-তে হোসেন মহ: এরশাদ সেনাপ্রধান থাকাকালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জিয়াকে হত্যা করে দখল করেন ক্ষমতা। হন রাষ্ট্রপতি। তিনি ইসলাম ও কোরানের নীতিকে দেশের সাংবিধানিক ভিত্তি ঘোষণা করে ইসলামকে করেন বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম'— যা অদ্যাবধি অব্যাহত।

মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর পিতার দেখানো পথ, নীতি, আদর্শকেই অনুসরণ করে চলেছেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন ('৯৯) তিনিও 'শত্রু সম্পত্তি' আইনটি বহাল রেখে বলেছেন, 'এই আইন প্রত্যাহার করা অসম্ভব। আমাদের দৃষ্টিতে এর কারণ, পৌত্তোলিক হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীরা কোরান ও হাদিসের নির্দেশ অনুসারেই চির শত্রু। তাই তাদের সম্পত্তি অবশ্যই শত্রু সম্পত্তি।' অতীব ধর্মপ্রাণা হাসিনা সপরিবারে চারবার হজ করেছেন। পাঁচবার নামাজ পড়েন। হাসিনার মন্ত্রীসভায় ছিল পাকবাহিনীর দুই দালাল মন্ত্রী। '৯৬-এর নির্বাচনে শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগের টিকিটে জয়ী হন হাজি সৈয়দ আবুল হোসেন, যিনি ছিলেন জামাতি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, পাক বাহিনীর দালাল, ইসলামি বাঙ্গলার সমর্থক, হিন্দু বিদ্বেষী। তাঁর একটি উক্তি, 'আওয়ামি লিগের কাছে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।...আওয়ামি লিগের ইসলাম পবিত্র কোরানের শিক্ষা এবং রসুলে করীম (দ:)-এর অনুশাসন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু থেকে তদীয় কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই একই চিন্তা ও চেতনার অনুসারী।' কাজেই পাকপন্থী, সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গাবাজ সুরাবর্দীর যোগ্যশিষ্য এবং হিন্দু বিদ্বেষী, ভারত-বিরোধী, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক শেখ মুজিবের কন্যা হাসিনাও যে চিন্তা, চেতনা, ধর্মে, কর্মে, আচার-আচরণে, নীতি-আদর্শে ও দেশ-দশ শাসনে পিতার অনুসৃত পথে হাঁটবেন, সেটাই স্বাভাবিক নয় কী? কারণ তিনিও যে পিতার রক্ত ও ডিএনএ বহন করছেন। যেমন পিতা তেমন কন্যা আর কী!

সত্যি বলতে কী, বিশ্বমানবতার শত্রু ইসলাম আজও এক বিশ্বত্রাস। সারা বিশ্বে জেহাদিরা ঘটাচ্ছে জাতিদাঙ্গা। কখনও কাফেরদের বিরুদ্ধে। কখনও বা নিজেদের মধ্যে। কারণ মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে বহু গোষ্ঠী। আফগানিস্তান তার জ্বলন্ত উদাহরণ। কোরান অবমাননার অপপ্রচার করে বাংলাদেশে দুর্গাষ্টমীর দিন ঘটনানো হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তালিবানপন্থী জঙ্গি জেহাদিরা বিভিন্ন মন্দির বিশেষত 'ইসকন' মন্দির করেছে আক্রমণ। লুঠ করেছে টাকা, সোনাদানা, রত্ন, অলংকারাদি। চালিয়েছে ভাঙচুর। সাধু-সন্তদের মারধর করেছে। তিনজন সাধুকে খুন করেছে। অগণিত মন্দির করেছে অগ্নিদগ্ধ। ভূলুণ্ঠিত করেছে বহু বিগ্রহ। বাংলাদেশের একটা বড়ো অংশে দুষ্কৃতীরা সশস্ত্র দাঙ্গা চালিয়েছে। ফলে হিন্দুদের জান, মাল ও নারীর ইজ্জতের ব্যাপক ক্ষতি ঘটেছে। সপ্তাহব্যাপী সেই দাঙ্গা থামাতে পুলিশ-প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য, সরকারই দাঙ্গা বন্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। একথার অর্থ, দাঙ্গায় সরকারি দলের মদত ও অংশগ্রহণ ছিল। সরকার অবশ্য অপরাধীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়েছে। আসলে এসবই সান্ত্বনা পুরস্কার। এক মন্ত্রী বলেছেন, সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ফেরানোর কথা। অন্য এক মন্ত্রী বলেছেন, 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন' চালু করার কথা। কিন্তু সংখ্যালঘুরা কথা বা আশ্বাসে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী কাজে। কারণ ইতিপূর্বে অমন কথা ও আশ্বাসবাণী অনেক শুনেছে তারা। এমনিতেই বাংলাদেশ দাঙ্গাপ্রবণ রাষ্ট্র। সেখানে প্রতি বছরই নানা অছিলায় ঘটানো হয় দাঙ্গা। কখনও গ্রামে, গঞ্জে বা পাড়ায়, কখনওবা সারাদেশে। প্রকাশ্যে বা গোপনে। চলে ইসলামের রীতি মেনে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ। কিন্তু 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে উঠেছে প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড়। জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন করেছে ঘটনার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয় সেটাই এখন দেখার। তবে দাঙ্গাবাজ জামাত, জেহাদি, তালিবানপন্থীদের তোল্লা দিলে হাসিনার পরিণতিও হবে তাঁর পিতা মুজিবেরই মত। কারণ 'পাপ ছাড়ে না বাপকেও।' অবশ্য ভারত সরকারেরও বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা উচিত। কারণ বাংলাদেশের বাঙ্গালি হিন্দুদের সঙ্গে ভারতের বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের রয়েছে আত্মি ক সম্পর্ক। □

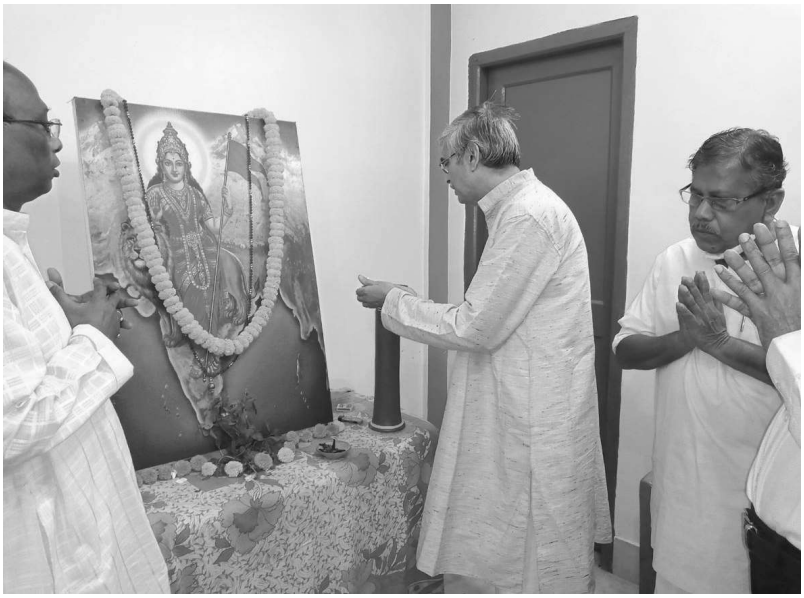

কলকাতায় স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন

বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা ‘স্বস্তিকা’র দক্ষিণবঙ্গের প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর। মানিকতলার নরেশ ভবনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা, হাওড়া মহানগর, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা-সহ কলকাতা জেলার সম্মানীয় প্রচার প্রতিনিধিরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভসূচনা করেন দক্ষিণবঙ্গের সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায় চৌধুরী। পৌরোহিত্য করেন স্বস্তিকার প্রকাশক সারদাপ্রসাদ পাল। পত্রিকার সম্পাদক ড. তিলকরঞ্জন বেরা উদ্বোধনী বক্তৃতায় স্বস্তিকার

আগামীদিনের রূপরেখা নিয়ে আলোকপাত করেন। স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষপূর্তি নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখেন তিনি। স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার তথা শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন দক্ষিণবঙ্গের প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। ভারত সরকারের ‘স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে’ যোগদানস্বরূপ বিশেষ সংকলন প্রকাশ করতে চলেছে স্বস্তিকা। আগামী জানুয়ারি থেকে স্বস্তিকার আঙ্গিক হবে সম্পূর্ণ রঙিন।

সম্মেলনের দ্বিতীয়ার্ধে সভাপতিত্ব করেন অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক রঞ্জনকুমার সাহু। স্বস্তিকার উপদেষ্টা বিজয়কুমার আঢ্য মূল্যবান মতামত দিয়ে সম্মেলন সমৃদ্ধ করেন। সম্মেলনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জয়রাম মণ্ডল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণবঙ্গ সামাজিক সমরসতা প্রান্তপ্রমুখ তাপস ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষককে দিনমজুরে পরিণত করেছে বামেরা

শেখর ভারতী

১৯৭৭-এ সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসর পর যে যুগান্তকারী (বামপন্থীদের দাবি মতো) দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার একটি হলো ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনার অধীনে অপারেশন বর্গা। এখনও মাঝে মাঝে বামমনস্ক অর্থনীতিবিদ কিংবা পাড়ার চায়ের দোকানের কর্মহীন সিটু নেতাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, কীরকম বুক ঠুকে বলবেন অপারেশন বর্গা ও ভূমিসংস্কারের যুগান্তকারী সুফলের কথা। বামপন্থী, নকশাল, মাওবাদী, খুনি হার্মাদ-সহ সমস্ত রকমের বাম-অতিবামদের অন্যতম প্রিয় ডায়লগ হলো, লাঙ্গল যার জমি তার। এবার টুক করে সহজ ভাবে অপারেশন বর্গা ও ভূমি সংস্কার নিয়ে একটা আলোচনা করে নেওয়া যাক। ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পরপরই বামেরা অপারেশন বর্গা করল। সময়টা খেয়াল করুন ১৯৭৭-৭৮-৭৯ স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বছর পর। এর আগেই স্বাধীন ভারতের সরকার জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল। ভূমি দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৯৫৩ সালে রাজ্যে জমিদারি বিলোপ আইন পাশ হয়। সেই আইনের মূল বিষয় ছিল, পশ্চিমবঙ্গে কোনও রায়ত ২৪ একরের বেশি জমি রাখতে পারবেন না। ব্যক্তিমালিকানায় থাকা ২৪ একরের বেশি জমিকে খাস ঘোষণা করেছিল সরকার। কলকাতা-সহ দেশের সিসিড ও ব্যারিস্তা ফেরৎ কৃষকবোদ্ধাদের জানিয়ে দিই ২৪ একর মানে প্রায় ৬৫ বিঘার কাছাকাছি জমি।

এরপর ১৯৫৫-তে আবার একটি ল্যান্ড রির্ফম অ্যাক্ট আসে। এরকমভাবে ১৯৭৭-এ সিপিএম যখন বাংলায় ক্ষমতায় এল তখন সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাতে গোনা জোতদার ছিল। জমিদার নয়, জোতদার। যাদের জমির পরিমাণ ওই মেরে কেটে ১০০ বিঘে কিংবা কিছুটা বেশি। কিন্তু সিপিএম তো কৃষকদরদী সরকার তাই এসেই, 'চলো আজ কুছ তুফানি করতে হ্যায়' বলে আবারও ভূমিসংস্কারের মধ্যে অপারেশন বর্গাকে লঞ্চ করে দিল ১৯৭৮-৮৯-এ। বাবার জমি সব ছেলে সমান পাবে এই নিয়ম থাকা পশ্চিমবঙ্গে ধরা যাক এক ব্যক্তির ৪টি ছেলে এখন সেই ব্যক্তির পরে চার ছেলের মধ্যে জমি ভাগ হলে প্রত্যেকের হাতে থাকল ওই গড়ে ১৭ বিঘে করে (২৪ একর রুলে) জমি। আর তার পরের প্রজন্মে? নিজেরাই হিসেব করে নিন। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বড়ো জমির জোত ভাগ হতে হতে ছোটো ছোটো জমি তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গে। এই ২০২১ সালে দাঁড়িয়ে কোচবিহার থেকে কাঁথি, বীরভূম থেকে বকখালি যদি একক মালিকানায় টানা পাঁচ বিঘের একটা জোত খুঁজে পান তাহলে সেটা এলিয়েন দেখার চেয়ে কম সৌভাগ্যের নয়।

এবার আসি বর্গায়। ভূমি সংস্কারের নামে চ্যাংড়ামো যা করার তা তো করেই দিয়েছিল এবার মরার উপর খাড়ার ঘা তো দিতে হবে তাই সিপিএম লঞ্চ করল গর্বের 'দ্য অপারেশন বর্গা', এর মাধ্যমে ঘোষণা হলো, লাঙ্গল যার জমি তার। অর্থাৎ যে ভাগচাষি কোনও জমির মালিকের জমিতে চাষ করেন তিনি বর্গা করে জমির চিরস্থায়ী মালিকানা পাবেন। এবার আগেই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে একক মালিকানা ভাগ হতে হতে হয়তো কোনও কৃষক পরিবারের হাতে ৪ থেকে ৫ বিঘে জমি ছিল। এই জমির উপর নির্ভর করে কষ্টে সংসার চলত, বর্গাদাররা সেটুকুতেও ভাগ বসিয়ে একটি কৃষক পরিবারকে দিন মজুরে পরিণত করল। ব্যাস এবার বামেরা শান্তি পেল। কারণ ওদের মোটোই হলো 'সবাইকে গরিব বানাও, দিন মজুর বানাও। তারপর তাদের নিয়ে রাজনীতি করো।' কারণ বামপন্থীদের চোখে নিজে বাদ দিয়ে বাকি সব অর্থবান লোক মানেই বুর্জোয়া। তা সে যত পরিশ্রম করেই অর্থবান হোক না কেন।

এখন মজার বিষয় হলো, জানেন কি দেশের কোন রাজ্যের কৃষি জমির মালিকরা বামেদের এই ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা এবং 'লাঙ্গল যার জমি তার' ডায়লগকে যাস্ট ছুঁড়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? পঞ্জাব। হ্যাঁ একদমই ঠিক পড়লেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একক মালিকানায় একসঙ্গে এক জোতে ৫ বিঘের জমিও পাওয়া দুষ্কর সেখানে পঞ্জাবের কৃষকদের অন্তত ৬০ শতাংশের একক মালিকানায় বড়ো (পাঁচ বিঘেরও বেশি) জোতের জমি রয়েছে। পঞ্জাবের কৃষকদের অনেকেরই ১০০ বিঘের উপর জমি রয়েছে একক মালিকানায়। আর যদি, 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই নীতি পঞ্জাবে লাগু করতে চায় বামেরা তাহলে পঞ্জাবের কৃষকরা রাতারাতি ভূমিহীন হয়ে যাবেন আর পঞ্জাবটা বিহার হয়ে যাবে। কারণ ওখানে কৃষিতে যুক্ত ৬০ শতাংশ শ্রমিক (লাঙ্গল আসলে যাদের) উত্তরপ্রদেশ বিহার থেকে যায় এখনও।

দিল্লিতে পঞ্জাবের কৃষকদের আন্দোলনে কোনও চাষি বাড়ির ছেলের বিএমডব্লিউ বা ল্যান্ড রোভারের সামনে দাঁড়ানো ছবি দেখে বাঙ্গলার অনেকে বলছেন, এরাও চাষি বাড়ির ছেলে? খোদ বামভাবধারায় বিশ্বাসী ছেলেপুলেরাও দেখলাম এরকম ছবিতে ঢোঁক গিলে বলছে, 'ইয়ে না মানে, ইয়ে মানে, হয়তো ছবিটা ফেক। কিংবা বাইরে থেকে কেউ কৃষকদের সমর্থন করছে। করতেই পারে...'

কিন্তু সাহস করে বলতে পারছে না, হ্যাঁ এও চাষি বাড়ির ছেলে। বলবে কী করে, চাষির ছেলে ল্যান্ড রোভার চড়ছে! এটা বাঙ্গলার বামপন্থী ছেলে-মেয়েদের কল্পনার অতীত। আর তাদের আদর্শ মতে এটা হওয়াও উচিত নয়। চাষির ছেলে ধুতি পরে টিনের বাক্স নিয়ে বিলের আড় দিয়ে স্কুল যাবে। বড়ো হয়ে ওই একটু চাষবাস, বেশি হলে স্কুল মাস্টারি করবে।

সিপিএম জিন্দাবাদ বলবে। বড়োজোর বোলেরো চড়ে বিয়ে করতে যাবে, তারপর স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডে বিনামূল্যের চিকিৎসা নিতে নিতে একদিন মরে যাবে।

ল্যান্ড রোভার, রোলস রয়, ল্যামবারগিনি চড়া এ কেমন চাষির ছেলে? বুর্জোয়ার হদ্দ একেবারে! যদি বাঙ্গলার বামপন্থী ছেলেপুলেরা সময় মতো কয়েকমাস পঞ্জাবে কাটিয়ে আসার সুযোগ পেতো তাহলে ফিরে এসেই লিখত, 'চাষি অপেক্ষা বুর্জোয়া জীবনে দেখি নাই'।

পঞ্জাবী গানগুলো শুনবেন, মিউজিক ভিডিয়োগুলো দেখবেন, ল্যামবারগিনি, ল্যান্ড রোভার নিয়ে শুটিং। অথচ হিটও। আপনি পশ্চিমবঙ্গে ল্যামবারগিনি নিয়ে লোকগীতির মিউজিক তৈরি করুন তো, লোকে বাড়ি বয়ে এসে কেলিয়ে যাবে। কারণ বাঙ্গলার চাষিরা ল্যাম্বারগিনি চড়তে পারে এ কল্পনার অতীত!

কিন্তু পঞ্জাব পারে, পঞ্জাবের চাষিরা পারে। কারণ কি জানেন? পঞ্জাবে সিপিএম ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল না। ওখানে 'সবুজ বিপ্লব' হয়েছিল। আর পশ্চিমবঙ্গে 'ভূমি সংস্কার আর বর্গার ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষির গলা টিপে ধরেছিল বামেরা। ছোটো ছোটো জমি বানিয়ে কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে নষ্ট করেই খান্ত হয়নি এরা! এরপর যখন দেশে প্রথম ট্রাক্টর এল, এরা বিরোধিতা করল। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে বলল, কৃষি শ্রমিকদের চাকরি কেড়ে নিয়ে ট্রাক্টর রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পঞ্জাবের (কৃষি জমির মালিক) চাষিরা জাস্ট দু'হাত তুলে স্বাগত জানাল ট্রাক্টরকে। এরপর একইভাবে পাওয়ারটিলার (হ্যান্ডট্রাক্টর), ধানকাটার স্বয়ংক্রিয় মেশিন, যা কিছু নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সামনে এল সিপিএম তার বিরোধ করল। এভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে ১০০ বছর পিছিয়ে দিয়ে বামেরা বিদায় নিল।

যদি কেউ বর্গা ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন তাহলে তাঁর চোখে পঞ্জাবের কৃষকরা জোতদাররা ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সিপিএম এবং বামপন্থীরাই একমাত্র হিপোক্রেট যারা বর্গাকেও সমর্থন করে আবার ইদানীং পঞ্জাবের জোতদার কৃষকদেরও সমর্থন করছে।

এবার আসি ছোটো জমির অসুবিধেটা কোথায়? প্রথম অসুবিধে ছোটোছোটো

নরেন্দ্র মোদী যদি 'মিডল ম্যান' ব্যবস্থাকেই সরিয়ে দেন তাহলে বামেরা আগামীদিনে কী নিয়ে আন্দোলন করবে? আর যাই হোক বামেদের প্রতিদিনের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়া ঠিক না!

জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা যায় না। না যায় স্বয়ংক্রিয় ধানকাটার মেশিন দিয়ে ফসল ঘরে তোলা। একটানা বেশি পরিমাণে একই জিনিস চাষ করা যায় না। জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় না।

আরও একটা বড়ো সমস্যা হলো ভূমি সংস্কার, বর্গা, হেনা তেনা করে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের একক মালিকানায় থাকা জমির পরিমাণ তলানিতে। এবার যেহেতু জমির পরিমাণ কম তাই সরকারিভাবে কৃষিঋণও কম পান পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা। একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। ইউপিএ আমলে একবার বকেয়া কৃষিঋণ মুকুব হয়েছিল দেশে। তখন পেপারে পড়েছিলাম পঞ্জাবের এক একজন কৃষকের ১০-১৫ লক্ষ টাকার ঋণ ছিল। তারা ঋণ মুকুবে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কৃষকরা? পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা এর এক তৃতীয়াংশও কৃষিঋণ পাননি।

সিপিএম এখন খুব করে চাইছে বাঙ্গলাতেও একটা কৃষক আন্দোলন হোক। তাহলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু সত্তর দশকের শেষের দিকে ক্ষমতায় এসে সিপিএম নিজের হাতেই বাঙ্গলার কৃষকদের আন্দোলনে যাবার রাস্তায় কাঁটা ফেলেছিল সযত্নে।

এবার আসি দিল্লির সিংঘু বর্ডারের কৃষক আন্দোলনে। জন্ম থেকে সিপিএম ও বামেরা চিৎকার করে আসছে চাষি ও ক্রেতাদের মধ্যে কোনও 'মিডল ম্যান' থাকবে না। এবার নতুন কৃষিবিলে ঠিক এই 'মিডল ম্যান'/'মান্ডি' ব্যবস্থাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছে ভারত সরকার। কিন্তু অবাকভাবেই এতেও সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা বামেরাই করছে।

দেখবেন কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে বামেরা উপর চালাকি করে কিছু শপিংমলের ছবি মার্কেটে ছাড়ছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা ভুট্টার দাম ৩০০ টাকা কিংবা একটা ফুলকপির দাম ২০০ টাকা। এই ছবির নীচে বামেরা লিখছে দেখো দেখো মোদী সরকার এরকমটাই চাইছে, চাষির কাছে একটাকায় ফুলকপি আর ৫০ পয়সাতে ভুট্টা কিনে আমবানী আমবানিরা তাদের শপিং মলে এত এত টাকায় বেচছে। এবার এখানে সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন হতে পারে, 'এখন তো মান্ডি ব্যবস্থা আছে। এত বছর ধরে তাই ছিল। নতুন কৃষিবিল তো ছিল না। তো এখন কি শপিংমলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। নাকি শপিংমলে ভুট্টা বিক্রি হচ্ছে না। নাকি চাষিদের থেকেও কম দামে ভুট্টা বিক্রি হচ্ছে শপিংমলে? এখন আদানি আমবানিরা কোথায় পাচ্ছে এই শাকসবজি কেনার সুযোগ? কার কাছ থেকে কিনছে? সহজ উত্তর-মান্ডি থেকে।

মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? আদানি আমবানিরা চাইলে মান্ডি থেকে কৃষিজাত পণ্য কিনতেই পারেন, বেচতেও পারেন নিজেদের শপিংমলে। কিন্তু চাষিদের থেকে সরাসরি কিনতে পারবেন না। বাহ জি বাহ, ভেরি গুড সলিউশন হ্যায় জি...

এই মান্ডি ব্যবস্থা যে কোনও দেশের কৃষকদের জন্য ভয়ংকর অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। আর কৃষিতে মিডলম্যান সরাও মিডলম্যান সরাও দাবি করে আসা বামেরা এই মান্ডির সমর্থনে আজ রাস্তায়! কেন? সহজ উত্তর, ভারত ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে যদি আইসিস ডেরাতেও কোনও ষড়যন্ত্র হয়, বামেরা 'খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন' বলে সেটাতেও যোগ দেবে। দ্বিতীয়ত, নরেন্দ্র মোদী যদি 'মিডল ম্যান' ব্যবস্থাকেই সরিয়ে দেন তাহলে বামেরা আগামীদিনে কী নিয়ে আন্দোলন করবে? দেখুন আর যাই হোক বামেদের প্রতিদিনের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়া ঠিক না!

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৪।।